আব্দুল হামীদ মাদানী

অবতরণিকা

মাদ্রাসার ছাত্র-জীবন নিয়ে এবারের লেখাটি। গরীব শ্রেণীর ছাত্র-জীবনে কত শত বাধা-বিঘ্ন আসে, তারই কিছুটা তুলে ধরা হয়েছে 'বন্ধুর পথ'-এ। অনেক ছাত্র মাদ্রাসায় আসে নিরুদ্দেশভাবে, কেউ কেউ আসে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অভিভাবকের চাপে। কেউ আসে রুযী-রুটির ধান্দায়। এখানে এসে নানা কষ্ট ও অসুবিধার জালে পড়ে অনেকে পড়া ছেড়েও দেয়। অনেকে 'ভিখিরি বিদ্যা' বলে এ পথটাকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখে থাকে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি যে ভুল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'বন্ধুর পথ'-এ সেই সব কথা নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে দ্বীনী শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। চরিত্রগঠন করতে এসে যাদের চরিত্রে ধস নামে, তাদেরকেও সতর্ক করা হয়েছে। গরীব ছাত্রদেরকে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে কাল্পনিক চরিত্রায়নের মাধ্যমে।

আমার সুদৃঢ় আশা, নবীন ছাত্ররা এ বই পড়ে পড়াশোনার প্রেরণা পাবে, বন্ধুর পথে চলার উৎসাহ পাবে, শত বাধা উল্লংঘন করার সৎসাহস পাবে। পরিশেষে বন্ধুর পথের পথিকের উদ্দেশ্যে বলি,

'আসবে পথে আঁধার নেমে
তাই বলে কি রইবি থেমে
বারে বারে জ্বালবি বাতি
হয়তো বাতি জ্বলবে না,
তাই বলে তোর ভীরুর মত
বসে থাকা চলবে না।'

------*আব্দুল হামীদ মাদানী*

২৮/৯/২০১১

(১)

শিহাব হাইস্কুলে ভরতি হয়েছে। ছাত্র হিসাবে খুব ভাল সে। প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের নিকট সে একজন ভাল ছেলেরূপে প্রসিদ্ধ। কিন্তু স্কুলটি অবৈতনিক নয়। বই-পত্রও বিনামূল্যে বিতরণ হয় না সেখান থেকে। গরীব মা-বাপের সন্তান সে। দু-বেলায় ভরপেট অন্ন জোটে না তাদের সংসারে। তা নিয়ে মা-বাপের অভাবের দাম্পত্যে প্রায় কলহ লেগে থাকে।

তবে মা শিক্ষিতা না হলেও মূর্খ নয়। মা হিসাবে নিজের দায়িত্ব যথাযথ পালন করে সংসারে। কিন্তু অভাব যার নিত্যসঙ্গী, তার দায়িত্ববোধে স্থায়িত্ব কোথায়?

আব্বা রোজগার করে, কিন্তু রোজ আনে, রোজ খায়। তাতে বার-বর্কত থাকে না। মোটা ভাত, মোটা কাপড়ে সংসার-যাত্রা নির্বাহ হয় তাদের।

স্কুলের সহপাঠীরা শিহাবকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে। তার স্কুল-ড্রেস যথার্থ মানের নয়। পায়ে জুতা পর্যন্ত সে পরে না। পাবে কোথায়, তাই পরবে সে? কিন্তু সে খবর কেউ রাখে না। দরিদ্রের দারিদ্র্য নিয়ে উপহাস করে সকলে। আর দারিদ্র্যের চাইতে তা নিয়ে উপহাসের ব্যথা বেশী অসহনীয়রূপে শিহাবের বক্ষকে ছিন্নভিন্ন ক'রে দেয়।

শিহাব টানাটানির সংসারের এমন দশা নিয়ে খুব ভাবে। আব্বার কায়িক পরিশ্রম ও আম্মার দুঃখ-জ্বালা দেখে তার কচি অন্তর ফেটে যায়। মনে মনে সে জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার সহজ উপায় খুঁজতে থাকে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার চিন্তা-চেতনা দিয়ে মা মাঝে-মধ্যে

বলে, 'সুখ পেতে হলে হয় কলমের সরসরানি, না হয় কোদালের সপসপানি চাই।' তার মানে লেখাপড়া শিখে চাকরি, নচেৎ জমি-চাষ ক'রে ধনী হয়ে সুখের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

কিন্তু জমি তো তাদের নেই। সুতরাং লেখাপড়ার পথ ছাড়া অন্য পথ রুদ্ধ। পরন্তু লেখাপড়াতেও খরচ আছে, আর সে খরচ বহন করার মতো ক্ষমতা তাদের নেই। স্কুলের বেতন মাসের-মাস ঠিকমতো যোগাতে পারে না। প্রয়োজন অনুপাতে বই-খাতা-কলম কিনতে পারে না। ফলে শিহাবের বুদ্ধির উন্মেষ ঘটে না। যখনই লেখাপড়ার সৎ সাহসের সূর্য আলো বিকীরণ ক'রে তার মনের আকাশে উজ্জ্বল হতে চায়, তখনই দারিদ্র্যের মেঘমালা এসে তাকে নিষ্প্রভ ক'রে ফেলে।

শিশু নিজ মা-বাপ তথা পরিবেশের মানুষের আচরণে প্রভাবান্বিত হয়। যে আচরণ তার মনে-প্রাণে প্রাধান্য ও গুরুত্ব পায়, সেই আচরণে সে ধীরে ধীরে অভ্যাসী হয়ে ওঠে। শিহাবের মা-বাপ প্রকৃতার্থে দ্বীনদার না হলেও কোনও অর্থে দ্বীনদার। তারা নিয়মিত নামায পড়ে, মা কুরআন পড়তেও জানে। মাঝে-মধ্যে সুললিত কণ্ঠে নামাযের পরে কুরআন তিলাঅতও করে।

গ্রামের কোন ছেলের সাথে তেমন বন্ধুত্ব নেই। গরীবের কোন বন্ধু থাকে না। আর স্কুলের পরিবেশ তো ধর্মনিরপেক্ষ। যদিও সেখানে সময়মতো নবী-দিবস ও প্রতিমা-পূজার আয়োজন করা হয়। কিন্তু শিহাবের মনে প্রভাব বিস্তার করে মায়ের মোহিনী-কণ্ঠের কুরআন তিলাঅত। তাই সে প্রত্যহ স্কুল থেকে এসে মসজিদে গিয়ে ইমাম সাহেবের নিকট কুরআনের ভাষা আরবী পড়তে শুরু করে।

অভাবের সংসারে কখনো কখনো কাজও করতে হয়। কখনো

আব্বার সাথে মাঠে, কখনো পাড়ার ছেলেদের সাথে এমন কাজ করতে হয়, যাতে দুটো পয়সা আসে। কখনো বা তারই জন্য স্কুল কামাই হয়ে যায়।

আব্বা কখনো কখনো স্কুল যাওয়া বন্ধ ক'রে দেওয়ার কথা বলে। পার্টির নেতা দিয়ে সুপারিশি দরখাস্ত দিয়েও বেতন মাফ করানো যায়নি। তাদের চাইতে বেশি ভাল অবস্থাসম্পন্ন ঘরের অনেক ছেলের ফুল বেতন মাফ করা হয়েছে, কিন্তু শিহাবের মাফ হয়েছে হাফ বেতন।

অনেক ছেলের প্রাইভেট টিউটর আছে, তার নেই। অনেকের পড়ার পরিবেশ ও প্রেরণা আছে, তার নেই। আর তার আব্বার কাছে সে পড়ার কোন ভবিষ্যৎ নেই।

মায়ের আশা আছে, ছেলে পাশ ক'রে চাকরি করবে। তার বংশের অনেকে চাকুরিজীবী। কিন্তু সে আশা সকাল বেলায় ঘাসের ডগায় শিশির বিন্দুর মতো এতই ক্ষীণ যে, একটু বেলা উঠতে-না উঠতেই বিলীন হয়ে যায়।

লক্ষ্যমাত্রা স্থির না ক'রে কোন কাজেই কাজীর মন বসে না। উদ্দেশ্যবিহীনভাবে কোন কাজ সফলতার সুদর্শন পায় না। শিহাবেরও সেই দশা ছিল। সে মনে মনে ভাবত, এইভাবে পড়ে সে কী করবে?

সে কি মাস্টার, ডাক্তার, ব্যারিস্টার, অফিসার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবে?

সেসব পড়ার জন্য তো খরচ আছে, তা পাবে কোত্থেকে? সুতরাং চাকরির আশা রেখে পড়াশোনা করা তো দুরাশা। আর কোন আশার সাথে মনকে না বাঁধলে কি অগ্রসর হওয়া যায়?

সেই সাথে ষান্মাসিক পরীক্ষার সময় সমাগত হল। একদিন ক্লাসে

নোটিস এল, যাদের বেতন বাকী থাকবে, তাদেরকে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না।

শিহাবের তিন মাসের বেতন বকেয়া। আব্বা চেষ্টা করেও সে বেতন পরিশোধ করার মতো কোন আশা দিতে পারল না। বিধায় শিহাবের আর পরীক্ষা দেওয়া হল না। সুতরাং তারপর থেকেই তার পড়াশোনা-প্রীতির ইতি ঘটল।

'অর্থ অপ্রতুলে কত দীন বাছাধন,
অজ্ঞান আঁধারে বসি কাটিছে জীবন।'

(২)

কিছুদিন বসেই কাটল বাড়িতে। আব্বা কাজ করতে বলে, কিন্তু কাজে তার মন বসে না। সে পড়তে চায়। কিন্তু তার পথ কোথায়?

মামা বলে, 'ওকে কাজে লাগিয়ে দাও।'

চাচা বলে, 'চাষে লাগিয়ে দাও।'

কেউ বলে, 'বাজারে কোন দোকানে লাগিয়ে দাও।'

মা বলে, 'ওর এখন কাজের বয়স হয়নি।'

সেদিন রাতের খাবারে মা রুটি তৈরি করেছিল। চাল অপেক্ষা আটার দাম কম। কিন্তু শিহাবের রুটি পছন্দ নয়। পানি খাবার বেলায় তিলের চাটনি দিয়ে খুদের জাউ অথবা গমঘাটা খেতে হয়। দুপুরে ভাত, আর রাতে রুটি। তাতে কোন রকম তাদের কালাতিপাত হয়।

খেতে বসে শিহাবের চোখে পানি দেখে আব্বার মেজাজ গরম হয়। রেগে বলে ওঠে, 'খাবি তো খা, না হয় উঠে যা। দু'বেলাতেই ভাত খাবি তো কামাই করতে শেখ।'

আব্বার রাগ দেখে ভয়ে শিহাব আধা রুটি কোন রকম গলাধঃকরণ ক'রে উঠে যায়। সহসাই সে বুঝতে পারে, সে যেন মা-বাপের গলগ্রহ হয়ে উঠছে। স্নেহ-প্রীতি-মায়া-মমতার বন্ধন যেন অর্থ ছাড়া ব্যর্থ হয়ে পড়ছে। অতএব তাকে অর্থ সঞ্চয় করতেই হবে।

কিন্তু এই কিশোর অবস্থায় সে অর্থ রোজগার করবে কীভাবে? দুঃখের কথা সে জীবন-খাতায় লিখে রাখে,

গরীব মোরা পিতা মোদের সারাটি দিন খাটে,
পেটের লাগি বনে কিংবা থাকে সুদূর মাঠে।
তপ্ত রোদে ঘিলু গলায় ঘাম পড়ে তার পায়ে,
প্রাণের উপর পণ করে হায় আমাদেরই দায়ে।
রক্ত শুকায় কখনও বা ভীষণ বজ্রপাতে,
প্রাণটি লুকায় শিলার ভয়ে শির ক্ষত আঘাতে।
গভীর রাতে ফিরে কখন চরম অন্ধকারে,
ঝড়ের মাঝে যায় কখনো মরণ-সাগর-পাড়ে।
রক্ত দিয়ে জীবন দিয়ে করছে যারা বড়,
ওগো প্রভু তাদের প্রতি তুমি রহম করো।
কান্না আসে বুক ফেটে হায় সহ গরীব সহ,
বিশাল সিন্ধু পড়েছে তাতে রাত্রি ভয়াবহ।
দুঃখ নাহি আসবে প্রভাত হইবে আলোকিত,
আজ নয় কাল তার পরের কাল যাতে খোদা প্রীত।

সেদিন বাড়িতে আব্বা ছিল না। মায়ের পাশে বসে শিহাব একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। মায়ের পরনে শাড়ীটিও ছেঁড়া ছিল। তা দেখে তার হৃদয়খানা 'হু-হু' ক'রে উঠল। মা বলল, 'তোর আব্বার কথায় দুঃখ

করিস না বাবা! দেখছিস তো, সারাদিন খেটে এসে ওর মেজাজ ঠিক থাকে না। গরীবের ঘরে যা জোটে, তাই খেতে হয় বাবা!'

---আমাকে রুটি খেতে ভাল লাগে না মা!

---বেশ আমি তোর জন্য অল্প ক'রে ভাত রেঁধে দেব।

---রুটি ক'রে আবার ভাত রান্না?

---কী করব বল? মায়ের মন যে মানবে না রে!

---আমরা এত গরীব কেন মা!

---আল্লাহর ইচ্ছা বাবা!

---চাচারা তো বেশ বড়লোক।

---তোর চাচা পড়াশোনা করেছে, মাস্টারি চাকরি পেয়েছে, তাদের বেশ চলছে। তোর আব্বা পড়াশোনা করেনি, তাই তার এই দশা। তোকে পড়াতে পারলে আমাদের অভাব থাকতো না। কিন্তু অভাবই চির অভাবী ক'রে রেখে দেবে আমাদেরকে।

---আচ্ছা মা! এমন কোন জায়গা নেই, যেখানে ফ্রি থেকে খেয়ে পড়াশোনা করা যায়।

---আছে তো। কিন্তু সে অন্য পড়া। তাতে বড় চাকরিও হয় না। তবে ভাল ফল করতে পারলে তাতেও সৌভাগ্য আছে।

---কী পড়া মা!

---আরবী পড়া। মাদ্রাসা লাইনের 'আলেম-ফাযেল' পড়া। পারবি তুই?

---হ্যাঁ পারব। ইমাম সাহেব বলছিলেন, আমার কুরআন পড়া নাকি খুব ভাল। পয়সা খরচ না হলে আমি মাদ্রাসায় পড়ব মা!

কিন্তু সে কথা শুনে মামা বলে, 'ও পড়া পড়ে কোন লাভ নেই।

পরিশেষে মসজিদে ইমামতি ক'রে মসজিদ ঝাড়ু দিতে হবে, আর লোকের লাথ-গুঁতো খেতে হবে।'

খালা বলে, 'ও পড়া পড়লে ভিক্ষা করতে হবে। আমাদের ঘরে প্রত্যেক শুক্রবার মাদ্রাসার ছেলেরা ভিক্ষা করতে আসে।'

গরীব ছেলের সম্মানজনকভাবে পড়াশোনার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়ার মতো সদিচ্ছা নেই অভিজাত মনের আত্মীয়দের, উল্টা তাকে সেই পথে বাধাগ্রস্ত করল। বিধায় শিহাবের মনে আরবী পড়ার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে গেল।

ইমাম সাহেবকে লোকের লাথ-গুঁতো খেতে হয়। কিন্তু শিহাব গ্রামের ইমাম সাহেবের অনেক কাছাকাছি চলে যায়। ইমাম সাহেব বড় উদার মানুষ। তিনি তাকে সঙ্গে নিয়ে নাশ্‌তা খান, দুপুর ও রাত্রের খানা খান।

একটি ফুলের কুঁড়িকে অকালে ঝলসে যেতে দেখে ইমাম সাহেব মনে-প্রাণে কষ্টবোধ করতে লাগলেন। তিনি একদিন শিহাবকে বললেন, 'তোমার কুরআন পড়া তো খুব ভাল। তুমি মাদ্রাসায় পড় না কেন? মাদ্রাসায় তো কোন খরচ লাগে না।'

শিহাব মুচকি হেসে বলে, 'মাদ্রাসায় পড়ে কী হবে? মৌলবী হয়ে লোকের লাথ-গুঁতো খেতে হবে।'

---ঘরে বসে থেকে কী হবে? ঘরে বসেও তো ঘরের লোকের লাথ-গুঁতো খেতে হবে। অকর্মণ্য লোককে কেউ ভালোবাসে না শিহাব। মা-বাপ, বউ সবাই ঘৃণা করে। এ বয়সে তুমি কাজ করতে পারবে না, যোগ্য কাজের প্রস্তুতি নাও। আর বড় হয়ে কাজ করলে তোমার আব্বার মতো পরিশ্রম করতে হবে।'

---কী করব আমি তাহলে?

---আমি বলি, তুমি মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে যাও। তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি ভাল আছে, তুমি বড় আলেম হতে পারবে। আর তাহলে লোকের লাথ-গুঁতো খেতে হবে না। বুখারী পড়াবে, বক্তৃতা করবে, তোমার বড় নাম ও মান হবে।

ইমাম সাহেবের কথাগুলির মাঝে শিহাব হিতাকাঙ্ক্ষিতা ও স্নেহের পরশ অনুভব করল। সাত-পাঁচ ভেবে বাড়িতে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল, সে মাদ্রাসায় পড়তে যাবে।

(৩)

মুআয্‌যিনের সাথে শিহাব একদিন স্থানীয় মাদ্রাসায় এসে উপস্থিত হল। সেখানে দেখল, তারই মতো বহু শিশু-কিশোর রয়েছে। মাদ্রাসার অফিস-ঘরে বসলে হেড মওলানা এসে উপস্থিত হলেন। সালাম-মুসাফাহার পর নাম-ঠিকানা জানতে চাইলেন। শিহাব যেন ঘাবড়ে উঠেছিল। কণ্ঠস্বর স্পষ্ট ছিল না। গলাটা ঝেড়ে নিয়ে নিজের নাম বলল, 'শিহাব।'

মওলানা বললেন, 'শিহাবুন সা-ক্বিব?'

শিহাব কিছুই বুঝল না, মুআয্‌যিনও না। অতঃপর মওলানা বললেন, 'মাদ্রাসায় পড়তে হলে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা পাঞ্জাবি পরতে হবে, ওই শার্ট পরা চলবে না। মাথায় অত বড় চুল রাখা চলবে না। আর জান তো, ঘন ঘন ঘর যাওয়া চলবে না। আরবী খুব কঠিন পড়া, আরবী---পারবি তো পারবি, না হয় হেগে-মুতে ছাড়বি! চৌদ্দ বছর পড়তে হবে। বড় ধৈর্যের দরকার। সে সবের প্রস্তুতি আছে তো?'

তিনি মাদ্রাসার হেড, কিন্তু তাঁর হেডে মাথা নেই। থাকলে তিনি

শুরুতেই এত সকল কথা বলে শিহাবকে ঘাবড়ে দিতেন না। স্কুল-পড়ুয়া ছেলে মাদ্রাসায় এসে এত ফতোয়া কি এক সঙ্গে মেনে নিতে পারে? কুরআনের বিধানেও তিনি জানেন, সংস্কার সাধন করতে হয় ধীরে-ধীরে। চিরাচরিত প্রথা ও অভ্যাসকে দূর করতে হয় ক্রমে-ক্রমে রয়ে-সয়ে। তবুও নিজেরা আমল করেন না।

গোদের উপর বিষফোঁড় মাদ্রাসার সেক্রেটারি ইতোমধ্যে উপস্থিত হয়ে নবাগত ছাত্রের সাদাসিধা বেশভূষা দেখে বললেন, 'যত সব বাড়িতে খেতে না পেয়ে মাদ্রাসায় চলে আসছে। মাদ্রাসায় ভাল ছেলে আসে না। যে আসে সে হয় অ-চ-ল অচল, না হয় অ-ধ-ম অধম।'

মুআয্যিন বললেন, 'না না, সবাই কি আর সমান হয়? এ ছেলে দেখবেন ভাল হবে।'

হেড মওলানা বললেন, 'সময়ে দেখা যাবে।'

ভর্তি হয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র আনার জন্য শিহাব মুআয্যিনের সাথে বাড়ি ফিরে গেল।

মা বাড়ির বাহির দরজার কাছে ছুটে এসে ছেলের কাছে খবর নিতেই সে ডুকরে কেঁদে উঠল। স্নেহপরবশ হয়ে ব্যাকুলতার সাথে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে বাবা? ভর্তি করল না, নাকি?'

ছেলে অশ্রু মুছে রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'ভর্তি ক'রে নিয়েছে। কিন্তু চৌদ্দ বছর পড়তে হবে বলছে।'

---কী হবে তা? তাই পড়বি।

---না, আমি অত দিন তোমাদেরকে ছেড়ে বাইরে থাকতে পারব না। হাঁটু অবধি লম্বা পাঞ্জাবি পরতে হবে। চুল এমন ছোট করতে হবে, যেন নখে ধরা না যায়। আবার সেক্রেটারি বলেছে, আমাদের ঘরে ভাত নেই বলে, আমি অধম বলে মাদ্রাসায় পড়তে চাচ্ছি।

---ছিঃ ছিঃ! ওতে দুঃখ করতে হয় না বাবা! শুরুতে সব কাজই একটু কষ্ট লাগে। তারপর ধীরে ধীরে তা সহজ হয়ে যায়। মাদ্রাসার নিয়ম মেনে চলতে তোর অসুবিধা কোথায়? পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চললে পাঁচ জনের সাথে আর খারাপ লাগবে না। এই দেখ না, বাঙালী মেয়ের লম্বা চুল ছোট করলে কত কথা হয়। কিন্তু প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মেয়েরা ছেলেদের মতো ছাঁটা চুল রাখে। সেখানে কেউ কোন কথা বলে না। আর অধমের পরিচয় প্রথম দেখায় পাওয়া যায় না। যারা বাহ্যিক বেশভূষা দেখে জ্ঞানের বিচার করে, তারা আসলে জ্ঞানী নয়। যারা জন্ম ও পোশাক না দেখে কর্ম-বিচার করে, তারাই প্রকৃত জ্ঞানী। অন্য দিকে অনেকে বলে, মাদ্রাসাতেই নাকি 'মনুষ্যমেধা' নষ্ট হয়। এ সব কথা নিজ নিজ বিবেক ও বিচারপ্রসূত। এ সব কথায় মন খারাপ করতে হয় না বাবা! নানা আঘাতের কথায় কান না দিয়ে সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে হয়। আর আমাদেরকে দেখতে পাওয়ার কথা? প্রত্যেক শুক্রবার বাড়ি চলে আসবি, তাহলে দেখবি মন খারাপ করবে না। কিছু পেতে হলে কিছু তো হারাতেই হয় বাবা। দুনিয়ার রীতিই যে এটা। সব কিছু এক সাথে পাওয়া যায় না। আমরা আমাদের ছেলেকে বড় আলেমরূপে দেখব, এটা কি কম আনন্দ ও সৌভাগ্যের কথা?

শিহাব দুই হাত দিয়ে চোখ কচলে শব্দহীন কান্না কাঁদতেই থাকল। রাতে আব্বা বাড়ি ফিরে এলে খবর শুনে চটে উঠল। বলল, 'ও পড়া পড়তে হবে না। যে পড়া পড়তে ঢোকার আগে এত কথা, এত বাধা, সে পড়াতে সালাম।'

কিন্তু আম্মা আব্বাকে ক্ষান্ত করে। একদিন শিহাব মাদ্রাসায় গিয়ে

'তালেবে-ইল্ম' হয়ে যায়।

(৪)

মাদ্রাসার পরিবেশ, সে এক আজব পরিবেশ। একটি রুমে সামান্য জায়গা মিলেছে। মাথার সিথানে সুট-কেশ রেখে সরু মতো ক'রে বিছানা বিছিয়ে শুতে হবে। ইলেক্ট্রিক আলো নেই, পাখা নেই। হ্যারিকেনের বাতিতে পড়তে হবে রাতে।

সকালে বাসি ভাত, তাতে লবণ ছাড়া কোন তরকারি দেওয়া হয় না। তাই কেউ কাঁচা মরিচ, কেউ কাঁচা পিয়াজ চিবিয়ে, কেউ তার সাথে ছোলা-ভাজা সেনে কোন রকম গলাধঃকরণ করে। কিন্তু শিহাব তা গিলবে কীভাবে? দুপুরে লাইন দিয়ে খাবার নিয়ে খেতে হবে। ভাতের সাথে একটিমাত্র তরকারি বাজারে সবচেয়ে সস্তা সবজির। তাতে তেল-পিঁয়াজের গন্ধও পাওয়া যায় না। তার সাথে অবশ্য ডাল থাকে। তবে তাতে মসুরির দেখা খুব একটা পাওয়া যায় না।

মাদ্রাসার পরিবেশও ভাল নয়। চারিদিক নোংরায় ভরতি। কোন কোন ছাত্র তামাক সেবন করে মুখে রেখে। অনেকে গুল দিয়ে দাঁত মাজে। অনেকের নাকি গুল না মাজলে পায়খানাও হয় না! অনেক হুজুর জর্দা-পান খান, অতএব ছাত্ররা গুল মাজলে দোষ হবে কেন? সেই গুল-পানের বোলে মাদ্রাসার সিঁড়ি, বাঁধানো ঘাটের গোড়া, দেওয়ালের কোণ, বাথরুমের ভিতর কালো ও রাঙা হয়ে আছে। বাথরুমের পশ্চাদ্‌প্রান্তে আলুর চোকা স্তূপ লেগে আছে। তরকারিতে অধিক পরিমাণে আলু ব্যবহারের জন্য এই অবস্থা। মাদ্রাসার কোন রুমে ধান ভরা, কোন রুমে আলু-পিঁয়াজ। আর সেই সাথে বোর্ডিং-এর

রান্না-বান্নার অবশিষ্টাংশ তো আছেই।

অনেক ছাত্র বোর্ডিং-এ খায়। এটাই তাদের জন্য ভাল। খাবার ভাল না হলেও কাদা-বৃষ্টি ও রোদে-শীতে দূরে গিয়ে কারো বাড়িতে জায়গিরি খেয়ে আসার চাইতে এতে অনেক সুখ। কিন্তু অনেকে জায়গিরি খায়, বোর্ডিং-এর চাইতে অনেক ভাল খাওয়া যায়, তাতে মাদ্রাসারও সাশ্রয় হয়।

শিহাবের ভাগ্যে একটি জায়গিরি জুটল গ্রামের এক প্রান্তে এক বাড়িতে। বোর্ডিং-সুপার বলে দিলেন, সে যেন সকাল হতে অন্যান্য ছেলেদের সাথে গ্রামে গিয়ে নিজ জায়গিরি-বাড়িতে চা এবং অন্যান্য সময়ে খেয়ে আসে।

শিহাব এ পর্যন্ত মা ও আত্মীয়-বাড়ি ছাড়া কোন অপরিচিত কারো বাড়িতে আহার করেনি। তার যেন কেমন সংকোচবোধ হতে লাগল। যাওয়ার পথে লজ্জায় তার পদযুগল যেন জড়িয়ে যেতে লাগল। তবুও নাচতে নেমে ঘোমটা টেনে লাভ নেই। এটাই যদি সাফল্যের পথের প্রথম ধাপ হয়, তাহলে সংকোচ ও লজ্জা কীসের?

বাড়ি ঢুকতেই শিহাব আদবের সাথে সালাম দিল। পর্দা-বাড়ি। কিন্তু সে নাবালক বলে তাকে কেউ পর্দা করল না। গৃহকর্তা বলে উঠল, 'ওগো! নতুন তালবিলুম এসেছে। ওকে চা দাও।'

সাথে সাথে এক মহিলা মেঝের উপর একটি ছোট চাটাই বিছিয়ে দিল। আর একজন হাসিমুখে চা এনে দিল। শিহাবের লজ্জা ও সংকোচ অনেকটা কেটে গেল। এরা তারা, যারা জান্নাতের লোভে এমন এক পথিককে প্রত্যহ অন্নদান করে, যার চলার বন্ধুর পথে ফিরিশ্‌তা ডানা বিছিয়ে দেন। বড় ভক্তির সাথে তারা আহার করায়। খাবার যাই হোক,

আদরের ভোজন, কী করবে ব্যঞ্জন?

কিন্তু হাতের পাঁচটি আঙ্গুল কি আর সমান হয়? চা-মুড়ি খাওয়া শেষ হলে গৃহকর্তা বলল, 'ওগো তালবিলুম! দশটার সময় এসে চাট্টি বাসি ভাত খেয়ে যেয়ো।'

কিন্তু চট্ ক'রে তার মুরুব্বী মা বলল, 'এই সকালে চা-মুড়ি খেয়ে যাচ্ছে, আবার বাসি ভাত কী? সেই দুপুরে ভাত খেতে আসবে।'

অন্যান্য দেশে সকালে দস্তর মতো নাশ্তা করে বলে তাদের আর কোন পানি-খাবার বেলা নেই। কিন্তু পাঞ্জেগানা চাল-খেকো বাঙালীর সকাল ও দুপুরের মাঝে পানি বা জল-খাবার বলে একটা বেলা আছে, সেই বেলায় কিছু না খেলে দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বড্ড খিদে লেগে যায়। যেহেতু সকালে চায়ের সাথে বাঙালী ঐ (মুড়ি) বিস্কুটের তত বল থাকে না।

শিহাবের তাতে বাধা পড়ে গেল। অনেক ছেলে বিকালে চা পর্যন্ত খেতে যায়, কিন্তু তার ভাগ্যে তাও জুটল না। বিষয়টি মাদ্রাসায় জানাজানি হলে একজন মওলানা তার প্রতি স্নেহপরবশ হলেন এবং নিজের নাশ্তার একটা অংশ তার জন্য নির্ধারিত করলেন।

সেটা সাময়িক সমাধান হলেও তাতে যে তার লজ্জা হয় না, তা নয়। জীবনে সাফল্যের গিরিপথে চলতে এসে সে দুর্গম পথও তাকে অতিক্রম করতে হচ্ছে।

আর পরের বাড়িতে গিয়ে খেয়ে আসা, সেও কম লজ্জার কথা নয়। বিশেষ ক'রে যখন সে বাড়ির লোক তার কাছে কোন খিদমত চায়, কোন খোঁটা দেয়, কোন দোষ ধরে, তখন তার লজ্জাশীল মন ভেঙ্গে চুরচুর হয়ে যায়।

একদিন দুপুরে তরকারি ভাল ছিল না। ভাত মুখে নিয়ে মুখেই ঘুরপাক খাচ্ছিল, গলায় নামছিল না। আর নোকসান হওয়ার ভয়ে সে তা ছেড়েও উঠতে পারছিল না। খেতে দেরি হচ্ছে দেখে এক মহিলা বলে উঠল, 'কি গো তালবিলুম! তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও।'

অন্য এক মহিলা বলল, 'আর খাবে না টি। দেখছিস না, বাঁদর-গালি পড়ে গেছে!'

প্রথম মহিলা বলল, 'আর খাবে না তো যাও, উঠে যাও, মুরগীতে খেয়ে নেবে।'

বৃদ্ধা তাদের কথা শুনে কটাক্ষ ক'রে বলে উঠল, 'ভাতে রুচি নাই। ভাত রোচে না রোচে মোয়া, চিঁড়ে রোচে পোয়া পোয়া।'

বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালা অনুভব ক'রে শিহাব সত্বর উঠে চলে যায়। কোন রকম সামলে নিয়ে দরজা পার হয়ে তার চোখের পানি অনায়াসে গালে গড়িয়ে পড়ে।

যেদিন তরকারি ভাল থাকে, সেদিন বাড়তি ভাত নিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু সে ইচ্ছা মায়ের কাছে প্রকাশ করা চলে, অন্যের কাছে নয়। মনের চাহিদা জলবিম্বের মতো ক্ষণিকে মনেই মিলিয়ে যায়। কোনদিন কেউ ভুলে জিজ্ঞাসা করলেও লজ্জায় সে 'নেবে না' বলে। কোনদিন আদর্শ-জ্ঞান দিয়ে পাশ থেকে অন্য কেউ বলে ওঠে, 'তালবিলুমকে বেশি ভাত খেতে হয় না।'

রাস্তায় পার হওয়ার সময় অন্যমনস্ক হয়ে যদি কাউকে সালাম না দেওয়া হয়, তাহলে সালাম পাওয়ার হকদার না হয়েও সে সালাম না দিয়েই বলে ওঠে, 'কেমন তালবিলুম? সালাম দাও না কেন?'

মাদ্রাসা বা মসজিদের জানালা দিয়ে তাকালে বলে, 'তালবিলুম হয়ে

জানলায় দাঁড়িয়ে আছ?'
রাস্তার ধারে বসলে বলে, 'তালবিলুম হয়ে রাস্তার ধারে বসে আছ?'
মাথায় চিরুনি নিলে বলে, 'তালবিলুম হয়ে মাথায় টেরি কাটছ?'
মাথায় টুপি না নিলে বলে, 'তালবিলুম অথচ মাথায় টুপি নেই!'
একটু ভুল হলেই 'তালবিলুম' বলে খোঁচা দেয়। যত দোষ যেন তালবিলুমেরই।

একদিন রাত দুপুরের ট্রেনে এক মেহমান মওলানা এসে উপস্থিত। বোর্ডিং-সুপার বললেন, 'শিহাব! তোমার জায়গিরি বাড়ি থেকে এক থালা ভাত পাওয়া যায় কি না দেখ তো।'

নিজের পেটের জন্য যে ঘরে যেতে পায়ে জড়তা আসে, আজ অপরের পেটের জন্য সে কীভাবে পদ-চালনা করে? তবুও আদেশ পালন করতেই হবে। বাড়িতে সে কথা বলতেই বৃদ্ধা বলে উঠল, 'এতো রাতে ভাত চাইতে চলে এসেছ? ভাতের হাঁড়ি কি চুলোয় চাপানোই থাকে?'

---জী, সুপার সাহেব বললেন.....।

---সুপার সাহেব বললেন বলেই চলে আসতে হবে?

গৃহকর্তা মুখ নিয়ে বলল, 'বেশ গো! ভাত নেই, চাট্টি মুড়ি নিয়ে যাও।'

সেদিনকার ঘটনায় শিহাব নিজেকে চরম অপমানবোধ করল।

তার উপর আর এক বালা এসে উপস্থিত হল। সকল নাবালক কিশোরকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মুষ্টির চাল আদায় করতে হবে। গ্রামে আদায়ের দায়িত্ব পড়লে রক্ষা, নচেৎ অন্য গ্রামেও যেতে হবে পায়ে হেঁটে। বাস বা ট্রেন-ভাড়া দেওয়া হয় না। ৫/৭ কিলো চাল হাতে বা

কাঁধে নিয়ে এক থেকে দশ কিমি. পর্যন্ত পথ হেঁটে আসতে হবে! আগে অবশ্য ভাড়া দেওয়া হতো। কিন্তু ছাত্ররা নিজেরাই তা বাঁচিয়ে নিজেদের পকেটে ভরত। তাই সুপার সাহেব সেটাও আর দেন না।

এ সব কথা শুনে আদায়ে অস্বীকার করার উপায় নেই। লজ্জা ও সংকোচের চাদর পরেও শুক্রবার সকালে বের হতে হল মুষ্টি আদায়ে। আজ সেই কথা সত্য হল, যে কথা আত্মীয়রা বলেছিল। 'মাদ্রাসায় পড়তে হলে ভিক্ষা করতে হয়।' দুঃখে প্রাণ ফেটে যেতে লাগল শিহাবের। চোখের পানিতে পথ দেখতে পাচ্ছিল না সে।

সাথে আরও একজন ছাত্র ছিল। সে ছিল পুরনো। শিহাবের এই অবস্থা দেখে বলল, 'কী হল শিহাব ভাই?'

---জীবনে কারো কাছে হাত পাতিনি। আজ কীভাবে বাড়ি-বাড়ি ভিক্ষা করব? কী বলে চাইব?

তার চোখের পানি মুছা দেখে সে বলল, 'ঠিক আছে, তোমাকে চাইতে হবে না, আমিই চাইব। তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে থেকো।'

কিন্তু এইভাবে সে কতদিন কর্তব্যে ফাঁকি দেবে। সবাই কি তার হয়ে অন্য দিনেও আদায় ক'রে দেবে?

ওস্তাদদের খিদমত করা সওয়াবের কাজ। কেউ যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে করে, তাহলে সে সওয়াবের অধিকারী হবে। কিন্তু বাধ্যতামূলকভাবে ঐ খিদমত করলে কি কেউ সওয়াব পাবে? কোন কোন হুজুরের পা টেপা নেওয়ার বদ অভ্যাস আছে। পড়াশোনার শেষে শোবার আগে মন না চাইলেও সে কাজ সেরে তবেই শুতে পাবে।

তারপর আছে ফজরের নামায। এ নামাযের জামাআতে শামিল হতে না পারলে চার আনা জরিমানা আছে। পয়সার মার, বড় মার। অনেক

শিশু-কিশোরেরা ডাকেও উঠে না। চাবুকের শাস্তি দিয়েও কোন কাজ হয় না। কিন্তু জরিমানার ভয়ে যথা সময়ে ঘুম ভেঙ্গে যায়। ফলে এই পয়সার চাবুক থেকে রেহাই পেতে অনেকে বিনা উযূতেই জামাআতে শামিল হয়ে যায়! হাজরিতে 'লাব্বাইক' বলে উযূ ক'রে পুনরায় নামায পড়ে।

ফজরে বাথরুমে লাইন পড়ে যায়। আর সেই কারণেও অনেকের জামাআত ফেল হয়ে যায়। মাঠে বসে পায়খানা করলেও জমি-ওয়ালা মাদ্রাসায় এসে চিল্লা-চিল্লি করে। পায়খানার পানি মারা নিয়েও পার্শ্ববর্তী জমি-ওয়ালাদের সাথে বাগ্-বিতন্ডা হয়।

মাদ্রাসার উঁচু ক্লাশের ছাত্রদের ফাই-ফরমাশ শোনাও একটা নৈতিক কর্তব্য। তাদের কথা না শুনলেও নানা হুমকি শুনতে হয়।

আর মুদার্রিসদের আদেশ পালন তো অবধার্য। সে ক্ষেত্রে অক্ষমতা প্রকাশের অবকাশ নেই। একদিন বর্ষা-ভেজা দুপুরে হেড মওলানা সাহেব দেখলেন, তাঁর রুমের জানালার রডগুলো খেয়ে যাচ্ছে। শিহাবকে টাকা ও একটি দড়ি-বাঁধা মাটির হাঁড়ি দিয়ে বললেন, 'শিহাব! জায়গিরি ঘরে খেয়ে ফেরার পথে মাজুর দোকান থেকে এক কেজি আলকাতরা নিয়ে এসো, জানলায় লাগাতে হবে।'

ফেরার পথে বৃষ্টি থামেনি। এক হাতে ছাতা, অন্য হাতে আলকাতরার হাঁড়ি ধরে কাদা পথে মাদ্রাসা ফিরে আসছিল। পরনের লুঙ্গির নিম্নাংশ ভিজে গিয়েছিল। এক জায়গায় পা পিছলে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। আলকাতরার হাঁড়ি ফুটে তার লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি বরবাদ হয়ে গেল। বহু কষ্টে পয়সা জোগাড় ক'রে গরীব বাবা যে পোশাক তাকে কিনে দিয়েছিল, তা বরবাদ হওয়াতে সে ভীষণ দুঃখ

পেল। তার উপর আলকাতরা নোকসান যাওয়াতে মওলানার কাছেও ভীষণ বকুনি শুনতে হল।

পড়াশোনাতে যতই ভাল হোক শিহাব, মানসিক পীড়ায় দগ্ধ হতে থাকল সে। এমন পরিবেশে টিকতে পারবে কি না, সেই চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে উঠল। নির্জনে লিখতে লাগল,

মাদ্রাসাতে পড়ি বলে নাই মোর সম্মান,
গ্রাম পরিবেশ কুটুম-বাড়ি সমান সর্বস্থান।
বাসে কত ঘৃণা, বলে কত কটু কথা,
কথা শুনে কচি প্রাণে লাগে বড্ড ব্যথা।
ভাবি, তবে কি আমি ভুল করেছি পড়ে,
যে বিদ্যা ফকীরের তার পিছে গেছি দৌড়ে?
সবাই বলে, কলেজে পড় মানুষ হবে বড়,
মাদ্রাসায় পড়িতে কেন দ্বারে দ্বারে ঘোর?
সুট-বুট-কোট-প্যান্ট পরিলে চোখে ভাল লাগে,
লম্বা জামা টুপি দেখলে ফকীর প্রাণে জাগে।
ও পথ কুঁড়েমির পথ কুঁড়ে লোকের কাজ,
কানা-খোঁড়া পড়বে সেথা সুঠাম দেহের লাজ!
মাদ্রাসায় পড়া নিয়ে কারো কাছে কথার আঘাত খেয়ে সে লেখে,
এ পথ কি কুপথ?
বল করিয়া শপথ।
এ পথ কি সুখের নয়, এ পথ নয় কি চিনা,
আছে কি অন্য পথে শান্তি শুধু এ পথ বিনা?
যদি তাহাই হয় তবে,

তুমি বুঝিয়া বুঝিবে যবে।
ছিন্ন করিব যেদিন আমি তোমার আশার ডোর,
ভুলিয়া কভু কহিও না মোরে, 'ওরে লম্পট চোর।'
যেদিন আমি তোমার দ্বারে যাইব দিতে হানা,
সেদিন যেন তুমি আমায় করিয়ো না কভু মানা।
নদীর মাঝে উত্তাল পানি এ যে তাহার বাঁধ,
ইহারে যদি ভাঙ্গিতে বল, তবে তুমি উন্মাদ।
আর কহিতেছ টাকার কথা, টাকা নাহি চিনি?
ইচ্ছা করিলে আমায় টাকার পাহাড় দেবেন তিনি।

(৫)

রাত্রি তখন প্রায় বারোটা। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নামাখা মনোরম রাতে মাদ্রাসার ছাদের এক প্রান্তে বসে গালে হাত দিয়ে কী চিন্তা করছিল শিহাব। মনের অবস্থা মোটেই ভাল নেই। এমন পরিবেশে তাকে চৌদ্দ বছর কাটাতে হবে? যখন তার বয়স ২৬/২৭ হবে, তখন পড়া শেষ হবে। তারপর সে কী করবে? কী চাকরি পাবে? মা-বাপের করুণ মুখে হাসি ফুটাবে কীভাবে? মা বলেছে, 'স্কুল লাইনে পারলাম না, মাদ্রাসা লাইনে তোকে বড় হতেই হবে।' কিন্তু মা গো! এ লাইনও যে লোহা-পাতা নয়। বিনা খরচে হলেও এ যে বড় কষ্টের লাইন। এ লাইনে আশা-গাড়ি চালানো যে বড় দুস্কর।

আনমনে বসে ছিল রেল লাইনের দিকে দৃষ্টি ফেলে। এমন সময় পিছন থেকে এক মওলানা এসে তার কাঁধে হাত রেখে পাশে বসে গেলেন। শিহাব শরমে একটু দূরে সরে বসতে গেলে তিনি বাধা দিয়ে

বললেন, 'বসো বসো। এত রাতে এখানে একা বসে কী চিন্তা করছ? বাড়ির জন্য মন খারাপ করছে?'

তিনি সালাফী সাহেব। বড় পরহেযগার আলেম। বড় ছাত্র-দরদী মওলানা তিনি। ছাত্রদের মনের অবস্থা অনুমান করে আধ্যাত্মিক চিকিৎসা করেন। মন-হারানো অন্ধকারে দিক-নির্দেশনা করেন, আঘাতে-বিপদে সান্ত্বনার প্রলেপ দেন। তিনিই ক্লাশ করতে দুঃখের কথায় কেঁদে ফেলেন। তিনিই ছাত্রদেরকে সর্বদা 'বাআমল আলেম' হওয়ার উপদেশ দেন। গরীব ছাত্রদেরকে তিনিই সাহায্য করেন। তাঁরই কাছে সে প্রত্যহ নাশ্‌তা খায়।

শিহাব অকপটে সমস্ত দুঃখ-কষ্টের কথা তাঁর কাছে খুলে বলল। বলতে বলতে চোখের অবারিত অশ্রুধারা আটকে রাখতে পারল না।

সালাফী সাহেব তাকে বুঝাতে লাগলেন। কথা বলতে বলতে নিজের রুমে নিয়ে গিয়ে বসালেন। শুরু করলেন দরদের কথা।

'ভেঙ্গে পড়ো না শিহাব। শক্ত হও। ঢেউ দেখে লা ডুবিয়ে দিয়ো না। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। অনেকটা বাংলা লেখাপড়া করেছ। তুমি পারবে। তুমি বড় আলেম হবে। কষ্ট দেখে ইষ্টলাভে পিছপা হয়ো না।

'কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে,
দুখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহিতে?'
'কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ,
উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ?'

কষ্ট ও আঘাত মানুষকে শক্তিশালী ক'রে তোলে। শান্ত সমুদ্রে কখনো সুদক্ষ নাবিক হওয়া যায় না।

'সাধ, সাধ্য আর সাধনা, তবেই সিদ্ধির বাসনা। যেখানে বাসনা রথ,

সেখানে সিদ্ধির পথ।' বাসনাকে পাকা কর তুমি। যেহেতু লক্ষ্য তোমার আকাঙ্ক্ষা ও বাসনায় পরিণত হবে, তাই একদিন তোমার সুখ ও আনন্দের উৎস হয়ে যাবে।

চৌদ্দ বছর পড়তে হবে শুনে তুমি ঘাবড়ে গেছ? আরে বুদ্ধি থাকলে সাত বছরেও আলেম হওয়া যায়।

তোমার বয়স তো এখন কম। আমি পড়তে বেরিয়েছিলাম বিয়ের পর। তুমি কেবল মা-বাপ ও ভাই-বোনের মায়ার বাঁধন ছিঁড়ে পড়তে এসেছ। আমাকে পড়তে যেতে হয়েছিল সেই সাথে নতুন বউয়ের প্রেমের জাল ছিঁড়ে। বিদায়ের রাতে সে কেঁদে কেঁদে আমাকে এমন দুর্বল ক'রে ফেলেছিল যে, ভেবেছিলাম, আর বুঝি পড়াই হবে না। তবে জ্ঞানী মেয়ে, পড়তে মানা করেনি। তাই সে বাধার সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পড়া শেষ করতে পেরেছি।

জায়গিরি-বাড়ির লোকেদের ব্যবহারে তুমি দুঃখ করো না। দু-একটা কাজ ক'রে দিলে তুমি তাতে সওয়াবের নিয়ত রেখো। তাদের উচিত, কোন বিনিময়ের আশা ছাড়াই তোমাকে অন্নদান করা। দানে বিনিময়ের আশা করলে সওয়াব বিনষ্ট হয়। তা বলে তুমি নিজেকে সওয়াব থেকে বঞ্চিত করবে কেন? এতে মাদ্রাসার সাশ্রয় হয় বলেই যথানিয়মে বহাল আছে। তুমি দু-এক বছর পরেই বোর্ডিং-এ খাবে। তাহলেই সে টেনশন আর থাকবে না।

মুষ্টির চাল আদায় অবশ্যই কষ্টকর বটে। লোকেরা তাকে 'ভিক্ষা' বললেও তা না করলে মাদ্রাসা চলবে কীভাবে বল? লোকেরা তো দ্বীনের কর্তব্য বুঝে হিসাবমতো আল্লাহর হক আদায় দিয়ে দ্বীনী প্রতিষ্ঠানকে টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করবে না। তাছাড়া যারা ঐ মুষ্টি দেয়

না, তারাই তাকে 'ভিক্ষা' বলে বদনাম করে। তাহলে এত লোকের খাবার সংকুলান হবে কোত্থেকে? এ মাদ্রাসায় তো কোন দিল্লী বা বোম্বাই-পার্টির দান আসে না। আরব থেকেও কোন সাহায্য আসে না। সরকারও দরকার ভাবে না সাহায্য করার। তাহলে দ্বীন-শিক্ষার ছোট প্রতিষ্ঠানগুলি কি বন্ধ ক'রে দিতে হবে। আর তা করলে স্থানীয় লোকেরা শিক্ষার আলো পাবে কীভাবে? বড় মাদ্রাসাগুলি তৈরি ছাত্র পাবে কোত্থেকে?

দ্বীন-দরদীরা একে 'ভিক্ষা' বলে আখ্যায়িত করে না। গৃহস্থের দরদী মা ভাতের চাল নেওয়ার সময় গরীব-দুঃখীদের কথা স্মরণ ক'রে এক মুষ্টি চাল হাঁড়ি থেকে তুলে রাখে। সপ্তাহে যা জমা হয়, তা থেকে মাদ্রাসায় দান করে। আর সে দরদী মা সেটাকে তাদের পরম সৌভাগ্য বলে মনে করে।

পক্ষান্তরে তুমি যখন মুষ্টি আদায় করতে যাবে, তখন তো আর নিজের জন্য যাবে না। তুমি যাবে আল্লাহর জন্য, আল্লাহর দ্বীনের জন্য, বহু গরীব ও এতীম ছেলেদের জন্য। তাহলে পরের জন্য ভিক্ষা করাও কি গর্বের বিষয় নয়?

এই দেখ না, আমি বড় লোকের ছেলে। কিন্তু দ্বীনের খাতিরে আমাকেও চেক নিয়ে ওশর-যাকাত ইত্যাদি আদায় করতে হয়। আদায় না করলে তো তাগূতী দেশে মাদ্রাসা চলবে না, মুদার্রিসের চাকরিও থাকবে না।

দেখেছ বাবা! গান-বাজনা, নাটক-যাত্রা, সত্যপীর করার জন্য চাল দিলে সেটা ভিক্ষা নয়, চাঁদা। পার্টির জন্য দিলে সেটা হয় চাঁদা, গরীব মেয়ের বিয়ের জন্য দিলে সেটাও চাঁদা। আর দ্বীন বাঁচাতে মাদ্রাসার

জন্য দিলে, সেটা হয় ভিক্ষা। যালেম মানুষদের এমন বিচারকে নিশ্চয় সমর্থন করবে না তুমি।

শিক্ষার্জনের পথে কষ্ট তো আছেই। কোন সাফল্যের পথই কুসুমাস্তীর্ণ নয়। ফুল-বিছানো পথ তোমাকে মর্যাদার উচ্চ শিখরে পৌঁছাতে পারে না। নানা কষ্ট বরণ করেই সাফল্যের সাক্ষাৎলাভ হয়।

তোমাদের জমি-জায়গা থাকলে হয়তো মাদ্রাসায় আসতে না। কিন্তু জমির পিছনেও শ্রমব্যয় করতে হয়। কষ্ট বিনা কি কোন ইষ্ট লাভ হয়?

'অন্নের লাগি মাঠে,
লাঙলে মানুষ মাটিতে আঁচড় কাটে
কলমের মুখে আঁচড় কাটিয়া
খাতার পাতার তলে
মনের ফসল ফলে।'

তুমি কলম-খাতা নিয়েও মেহনত করলে তার ফল ফলবে।

তোমার প্রশ্ন, পড়ার শেষে তুমি কী করবে? ঠিকই বলেছ। লক্ষ্য স্থির না করলে চলার গতি দুর্বার হয় না। তুমি মসজিদের ইমামতি করার স্বপ্ন দেখো না। 'যে আলেমের নাইকো গতি, তিনিই করেন ইমামতি।' ছোট মাদ্রাসায় চাকরি ক'রে পেট চালাবার ছোট নিয়ত রেখো না। আশা করলে বড় আশা করতে হয়। আশা ও বাসা ছোট করতে হয় না।

জ্ঞানীরা বলেন, 'কোন কাজ শুরু করতে হলে শুরু করতে হয় একটি জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা দিয়ে। অল্প আগুন যেমন অনেক উত্তাপ দিতে পারে না, তেমনি দুর্বল ইচ্ছাশক্তি কোন মহৎ সিদ্ধিলাভ করতে পারে না।' তুমি লক্ষ্য রেখো তুমি বড় বক্তা হবে, বড় লেখক হবে, বড় মুহাদ্দিস হবে। তুমি মক্কা অথবা মদীনা ইউনিভার্সিটিতে পড়ার

স্কলারশিপ পাবে। আর তা হলে তোমার পেটের ধান্দা থাকবে না।

খবরদার! পেটের চিন্তা নিয়ে এ পড়া পড়ো না। চাকরির লোভে তাগূতী সরকারী লাইনের দিকে ঝুঁকে পড়ো না। এ লাইন বড় পবিত্র, তার সাথে অপবিত্রতার সংমিশ্রণ ঘটায়ো না। নচেৎ ইহকালে টাকার গদিতে শয়ন করতে পেলেও পরকালে শয়নের গদি হবে আগুনের।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে বিদ্যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, তা যদি একমাত্র সামান্য পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে কেউ শিক্ষা করে, তাহলে সে কিয়ামতের দিনে জান্নাতের সুগন্ধটুকুও পাবে না।"

"কিয়ামতের দিন অন্যান্য লোকেদের পূর্বে যে তিন ব্যক্তির প্রথম বিচার হবে তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি সে, যে ইল্‌ম শিক্ষা করেছে, অপরকে শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন পাঠ করেছে। তাকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তাকে (পৃথিবীতে প্রদত্ত) তাঁর সকল নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও সব কিছু স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, 'এই সকল নেয়ামতের বিনিময়ে তুমি কী আমল ক'রে এসেছ?' সে বলবে, 'আমি ইল্‌ম শিখেছি, অপরকে শিখিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টিলাভের জন্য কুরআন পাঠ করেছি।' আল্লাহ বলবেন, 'মিথ্যা বলছ তুমি। বরং তুমি এই উদ্দেশ্যে ইল্‌ম শিখেছ, যাতে লোকেরা তোমাকে আলেম বলে এবং এই উদ্দেশ্যে কুরআন পড়েছ, যাতে লোকেরা তোমাকে ক্বারী বলে। আর (দুনিয়াতে) তা বলা হয়েছে।' অতঃপর (ফিরিশ্তাদেরকে) নির্দেশ দেওয়া হবে এবং তাকে উবুড় ক'রে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"

সুতরাং নিয়তকে শুদ্ধ ও পবিত্র কর। আমি জানি তুমি পারবে।

সমাজে 'রব্বানী' আলেমের প্রয়োজন আছে। আমি আশা করি, তুমি একজন 'রব্বানী' আলেম হবে। অতএব তুমি অগ্রসর হও। তোমার নাম শিহাব। 'শিহাবুন সা-ক্বিব' (জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড)এর মতো লক্ষ্যপথে ছুটে চল।

এ পথ জান্নাতের পথ "যে ব্যক্তি এমন পথে চলে--যাতে সে (দ্বীনী) বিদ্যা অর্জন করে, তার জন্য আল্লাহ জান্নাতের পথ সহজ ক'রে দেন। আর যখনই কোন সম্প্রদায় আল্লাহর কোন এক ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে ও আপোসে তা অধ্যয়ন করে, তখনই (আল্লাহর পক্ষ থেকে) তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, তাদেরকে (আল্লাহর) রহমত আচ্ছাদিত ক'রে নেয়, ফিরিশ্তা তাদেরকে ঘিরে নেয় এবং আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী (ফিরিশ্তা)দের মধ্যে তাদের কথা আলোচনা করেন।"

জানো কি শিহাব? "ইহজগৎ অভিশপ্ত, এর মধ্যে যা কিছু আছে সব অভিশপ্ত। তবে মহান আল্লাহর যিক্র ও তার সংশ্লিষ্ট ক্রিয়া (তাঁর আনুগত্য) এবং আলেম অথবা তালেবে-ইলমের কথা স্বতন্ত্র।"

জানো একজন আবেদের উপর আলেমের ফযীলত কত? "আলেমের ফযীলত আবেদের উপর ঠিক সেই রূপ, যেরূপ নবীর ফযীলত সাহাবীদের উপর। আবেদের উপর আলেমের ফযীলত ঠিক তেমনি, যেমন সমগ্র নক্ষত্রপুঞ্জের উপর পূর্ণিমার চাঁদের ফযীলত।"

তাহলে যে আবেদ নয়, এমন সাধারণ মানুষের উপর একজন আলেমের ফযীলত কত?

জানো? "আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্তাকুল, আসমান-যমীনের সকল বাসিন্দা এমনকি গর্তের মধ্যে পিঁপড়ে এবং (পানির মধ্যে) মাছ পর্যন্ত

মানবমন্ডলীর শিক্ষাগুরুদের জন্য মঙ্গল কামনা ও নেক দুআ ক'রে থাকে।"

তুমি ইল্ম তলবের পথে গমনাগমন করছ। তাই তোমাকে লোকে 'তালেবে-ইল্ম' বলে।

এতক্ষণে মুখ খুলে শিহাব বলল, "কিন্তু অনেক লোকে তো আমাকে 'তালবিলুম, তালবিলুই' বলে!"

---ও তো ব্যঙ্গকারীদের কথা বাবা! রিযাউলকে যেমন তাচ্ছিল্য ক'রে বিকৃতি ঘটিয়ে বিদ্রূপকারীরা 'রিজুনে', ফটিককে যেমন 'ফটকে' বলে, তেমনি তালেবে-ইল্মকে তাচ্ছিল্য ক'রে তার নামের বিকৃতি ঘটায়। যা মহা অন্যায়। অবশ্য কিছু তালেবে-ইল্মদের চারিত্রিক দোষে তারা তাচ্ছিল্যের শিকার হয়েছে। আল্লাহ সকলের হিসাব নেবেন।

অথচ "যে ব্যক্তি এমন পথে গমন করে, যাতে সে জ্ঞানার্জন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম ক'রে দেন। আর ফিরিশ্তাবর্গ তালেবে ইল্মের জন্য তার কাজে প্রসন্ন হয়ে নিজেদের ডানাগুলি বিছিয়ে দেন।"

কিন্তু আয়নার পারা খসে পড়লে যেমন আয়নার কদর থাকে না, তেমনি হয়েছে অনেক আলেম ও তালেবে-ইল্মের অবস্থা।

যদিও "উলামা সম্প্রদায় পয়গম্বরদের উত্তরাধিকারী। আর এ কথা সুনিশ্চিত যে, পয়গম্বরগণ কোন রৌপ্য বা স্বর্ণ মুদ্রার কাউকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে যাননি; বরং তাঁরা ইল্মের (দ্বীনী জ্ঞানভান্ডারের) উত্তরাধিকারী বানিয়ে গেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তা অর্জন করল, সে পরিপূর্ণ অংশ লাভ করল।"

তুমি কি চাও না শিহাব! সেই পরিপূর্ণ অংশ লাভ করতে?

কথাগুলি শুনে শিহাবের মন যেন হাল্কা হয়ে গেল। কোন অজানা জ্বালার উপর যেন শীতল মলমের প্রলেপ পড়ে গেল। বড় খোশ হল সে। চলার পথে সে আলো পেল, উৎসাহ পেল, প্রেরণা পেল।

পুনরায় সালাফী সাহেব বললেন, 'তোমাকে আবারও বলছি বাবা! এ পথে ফুল বিছানো নেই, বরং কাঁটা বিছানো আছে। সাবধানে চলো। আর সেই জন্য আমার কয়েকটি উপদেশ বিশেষভাবে মনে রেখো ঃ-

এক ঃ আল্লাহর কাছে উঁচু আশা রাখ। হীনম্মন্যতার শিকার হয়ো না। নিজেকে ছোট ভেবো না। কারণ মনের দিক দিয়ে যে দুর্বল, কর্মক্ষেত্রেও সে দুর্বল। তবে মনে অহংকার যেন না থাকে।

দুই ঃ মানুষের কাছে প্রাপ্য অধিকারের আশাও রেখো না। কেউ তোমাকে সম্মান করবে, কেউ তোমাকে আগে সালাম দেবে, কেউ তোমার উপকার করবে ইত্যাদি আশা রেখো না।

তিন ঃ কেউ তোমার উপকার করলে, সে কথা সোনার প্লেটে, আর তুমি কারো উপকার করলে পানির উপর লিখে রেখো।

চার ঃ তুমি সৎ ও সঠিক পথে থাকলে সমালোচনাকে পরোয়া করো না। মনে রেখো, হাথী চলতা রহেগা আওর কুত্তা ভুঁকতা রহেগা।'

পাঁচ ঃ জ্ঞানীর সাথে বন্ধুত্ব করো, আর কপট বন্ধু থেকে সাবধান থেকো।

আর জেনে রেখো, তোমার উন্নতির পথে ৫টি প্রতিবন্ধক আছে; আলস্য, নারী-প্রেম, অসুস্থতা, বাড়ির টান এবং আত্মগর্ব। এ সব থেকে সাবধান থাকবে।

রাত গভীর হতে চলেছিল। উপদেশ দিয়ে মওলানা শিহাবকে নিজের

রুমে গিয়ে ঘুমিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন। শিহাব ওস্তাদের শুকরিয়া জানিয়ে উঠে গেল।

(৬)

শিহাবের যেন নতুন জীবন শুরু হল। নতুন আগ্রহ, নতুন উদ্দীপনা। গোলাপ ফুল দেখে সে মনে মনে কামনা করল,

গোলাপ তুমি ফুটিয়া ছোটাও গন্ধ অবিরত,
আশা আমার এই যে, আমি হইব তোমার মত।

আল্লাহর কাছে দুআ ক'রে লিখে রাখল,

হৃদি মাঝে গুঞ্জরণ, বুক ভরা আশা
ফুটাইয়া তুলো প্রভু মুখে দিয়ো ভাষা।
হৃদয়ে আশার শুধু ফুটাইয়া কুঁড়ি,
ঝরায়ে দিয়ো না তাহা, এই দুআ করি।

ক্লাশের পড়া বিশেষ ক'রে আরবী ব্যাকরণ বুঝতে তার কোন অসুবিধা হয় না, কারণ সে স্কুলে ইংরেজী গ্রামার পড়েছে। বাড়ি যাওয়া কম হয়ে যায়। মাদ্রাসার মধ্যে সে প্রথম স্থান অধিকার করে। কমিটি ও গ্রামের মাঝে তার সুনামের চর্চা হয়।

বাংলার দিকে তার ঝোঁক আগে থেকেই ছিল। বিকালে মাদ্রাসার লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে লাইন অথবা ক্যানেল ধারে বেড়াতে গিয়ে এক মনে পড়তে বসে।

নিজেও কবিতা লেখে, গল্প লেখে, নিজের জীবনের রোজনামা লেখে। ফুল আঁকে। অনেক ছেলে তার কাছে কবিতা লিখিয়ে ও ফুল আঁকিয়ে নেয়। অভ্যাসগতভাবে যেখানেই কোন কাগজ পড়ে থাকে,

সেখান থেকেই তা তুলে নিয়ে পড়ে এবং কোন মূল্যবান কথা থাকলে তা নোট ক'রে রাখে। তার নীতি হল,

'যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই,
পাইলে পাইতে পার অমূল্য রতন।'

ধীরে ধীরে তার মনের আকাশে তারুণ্যের নবারুণ রাঙা হয়ে উদিত হল। বুদ্ধি বাড়ল, বন্ধু বাড়ল। বুদ্ধিমান বন্ধু পেল বুদ্ধির বিকাশে। কিন্তু অনেক খল বন্ধুও তার বন্ধুত্ব পেল টাকা-পয়সা ব্যয় ক'রে।

সালাফী সাহেব উপদেশে যে সতর্কতার কথা বলেছিলেন, তা আর পালন করা গেল না। গায়ে-পড়া বন্ধুর আকর্ষণ থেকে বাঁচা যে বড় মুশকিল।

বন্ধুত্বের জীবনের নতুন আগমনেও সে বাড়ির কথা অনেকটা ভুলতে পারল। বন্ধুদের সাথে অনেক কথা হতে লাগল। জীবনের কথা, নব-যৌবনের কথা, কিশোরীদের কথা, তরুণীদের কথা।

শিহাবের মনে-প্রাণে যেন বসন্ত এল। চোখে-চোখে যেন বসন্তের বাহার এল। সে মাদ্রাসা-প্রাঙ্গনে ফুলের গাছ লাগাল বন্ধুদেরকে নিয়ে। পুকুরের পাড়ে আম, জাম, কাঁঠাল ও পেয়ারা গাছ লাগালো। সেখানে একটি আমড়ার গাছ ছিল। আহারে কি আমড়া, শুধু আঁটি আর চামড়া। তাও আমড়ার সময় আমড়া রান্না দিয়ে ভাত খেতে হতো বলে উঁচু ক্লাশের অনেক বড় ছেলে তাকে সেই গাছটিকে কেটে ফেলতে পরামর্শ দিল। কিন্তু সুপার সাহেবের অনুমতি নিতে গিয়ে তাকে ধমক খেতে হল।

ফুলগাছ তার অতি প্রিয়। এমনকি জায়গিরি বাড়ির আঙিনার এক পাশেও সে গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকা ও রজনীগন্ধার গাছ লাগিয়ে নিজেকে ধন্য

মনে করল। এর ফলে সে সকলের মনের কাছে ফুলের মতোই আকৃষ্ট হল।

গ্রামের মসজিদের আঙিনাতেও বেলি, গোলাপ ও করবীর গাছ লাগিয়ে নিজের নাম স্মরণীয় করল। অবশ্য এ কাজ সে নাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে নয়, বরং নেশায় করে। এই নেশার কারণেও সে স্বপ্নেও ফুল-ফলের গাছ লাগায়, গাছের গোড়ায় পানি দেয়। ফুলগাছ কেউ নষ্ট করলে অথবা ফুল ছিঁড়ে ফেললে তার উপর গরম হয়।

পাশের গ্রামের পঞ্চায়েত অফিসে একটি প্রদর্শনী মেলা লাগল। সেখানে গ্রাম্য মহিলাদের হাতের তৈরি রুমাল, কাঁথা, চাটাই ইত্যাদি প্রদর্শিত হল। সেখানে প্রথম পুরস্কার লাভ করল জাসমীনা। সে ছিল শিহাবের জায়গিরির মেয়ে। যে কাঁথার উপর সে পুরস্কার লাভ করেছিল, তা ছিল শিহাবের হাতে আঁকা। এ নিয়ে বন্ধু-মহলে ও মাদ্রাসায় বড় চর্চা হল। হিংসাই যাদের স্বভাব, তারা এতে বড় কষ্ট পেল। কেউ শাবাশি দিল, কেউ করল ঠাট্টা। এতে শিহাবের মন একদিকে যেমন আনন্দিত হল, অন্যদিকে হল নিরানন্দ।

মানুষের যখন পুষ্প-সৌরভের মতো সুনাম ছড়ায়, তখন তার শত্রু সৃষ্টি হয়। সমপর্যায়ভুক্ত মানুষের মনে হিংসার আগুন জ্বলে ওঠে। তাদের মন বলে, 'ও পারে, আমি পারি না কেন? ওর নাম হয়, আমার হয় না কেন? আমার নাম না হলে, ওর নামও হতে দেব না। অথবা ওর সুনামও যাতে বদনামে পরিণত হয়, তার চেষ্টা করব।'

আর তখন থেকেই তার ছিদ্রান্বেষণ চলে। তার দোষ খোঁজা হয়। যাকে দেখতে লারি, তার চলন বাঁকা হয়। তার গায়ে কাদা ছুড়বার চেষ্টা করা হয়। মিথ্যা অপবাদ রচনা ও রটনা করা হয়। অনেক বন্ধুও

শত্রুতে পরিণত হয়। শত্রুও সুযোগ বুঝে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টায় অপেক্ষমাণ থাকে।

যে হাওয়ায় আনে হাসি
ঘন ঘন আসি আসি
সেই তো আবার ঝড় হয়ে যায়।
যে ফুলে আনে হাসি,
সে ফুলেই দেয় গো ফাঁসি।
ঘর থেকে সে পর হয়ে যায়।

আর বন্ধু শত্রুতে পরিণত হলে, তার পরিণাম হয় সবচেয়ে বেশি ভয়ানক। যেহেতু সে পূর্বজ্ঞাত রহস্য ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শত্রুতা করে। প্রীতিকর যখন হাতছাড়া হয়, তখন ভীতিকর হয়ে ওঠে।

কিছু খল বন্ধু শিহাবের পিছনে লাগল। যে ছিল প্রাণপ্রিয় বন্ধু, সে আজ পর হয়ে গেল। মানুষের মন বড় আজীব। পদ্মপত্রের উপর বৃষ্টি-বিন্দুর মতো বড় টলমলে। মৃদু বাতাসে কখন গড়িয়ে যায়, তার টের পাওয়াও যায় না। ফাঁকা ময়দানে পড়ে থাকা তুলোর মতো, কখন সামান্য হাওয়ায় দূরে সরে যায়, তা বুঝাও যায় না। এমন কিছু বন্ধুর কথা শিহাব কবিতায় লেখে,

বন্ধুর বাকে 'হুঁ-হুঁ' করিলে
বন্ধুরা লয় কোলে তুলে
ন্যায়-অন্যায় দৃশ্য নহে তার।
নিধুবন তরে গাহিয়া গাহিয়া
নন্দিত হয় স্পন্দিত হিয়া
দলিতের কথা নহে তার শুনিবার।।

ব্যথিত হৃদয়ে করুণ মর্মে
বলিয়া কথা বেফাঁস চর্মে
থতমত খায় কাঁপিয়ে ওষ্ঠাধর।
আসল কথায় বন্ধু বেজার
কহে বন্ধু, 'বড় দুরাচার'
সত্য যাহা ঢাকিয়া তাহা আনে কথান্তর।।
ফুলিয়া ওঠে রাগের চোটে
মোর লাগি তার যশ বা টুটে
সিংহ-চক্ষে তাকায় আমার প্রতি।
বন্ধু যাইবে নচেৎ সত্য
বিরোধ হইবে আমার কথ্য
ভেবে মরি, এত সবেগে কোথায় আমার গতি?

কপট বন্ধু সামনে প্রশংসা করে, পিছনে বদনাম। সামনে সুনাম গায়, পিছনে দুর্নাম। সে সব কথা শিহাব কবিতায় লেখে,

আমি তোমার প্রিয় বন্ধু এ কথাটি মানি,
হয় না কিছু আমি ছাড়া তাহাও ভালো জানি।
কিন্তু যখন চাহিব এমন স্বার্থে লাগিবে ঘা,
ত্যাগ স্বীকারি দেবে কি আমায় খুশী মনে দানি?
বন্ধু তুমি দস্তরখানে মস্ত বড় নন্দিত,
হৃদয় তোমার আমার সাথে সেই হেতুতে বন্দিত।
ইয়ার তুমি পিয়ার কর সম্মুখেতে বন্দনা
যাইলে পিছায় তোমায় দেখি' হৃদয় কেন স্পন্দিত?
মিষ্টি হাসি ছবি মুখে হৃদয়ের সুধাকর,

কিন্তু অন্তর তোমার মন্তর পড়ে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর।
সাক্ষাৎ হেতু আলিঙ্গন যবে করতে যাইব আমি,
আচমকা তুমি মারিবে আমারে পঞ্জরে খঞ্জর!

(৭)

শিহাব যখন মাদ্রাসায় আসে, তার আগে জাসমীনার বিবাহ হয়েছে। সুন্দরী চপলা যুবতী সে। রোমান্টিক মনের স্কুল-মকতব-পড়া কামিনী। তার বিয়ে হয়েছে এক শিক্ষিত ছেলের সাথে। ছেলে বড় পরহেযগার, দ্বীন ও তবলীগ-ভক্ত। স্ত্রীর চাইতে সে তবলীগকে বেশি ভালবাসে। স্ত্রীর আঁচল ধরে বসে থাকার চাইতে সে আল্লাহর পথে ঘুরতে বেশি পছন্দ করে। চিল্লা দিয়ে যখন বাড়ি ফেরে, তখনও সে উদাসীন। স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ নেই। রোমান্টিক স্ত্রীর প্রতি কোন রোমান্স্ নেই। স্ত্রীর সাজগোজ সে পছন্দ করে না। লিপস্টিক-ব্রা কিনতেই চায় না। কোনদিন সাজলেও সে নয়নভরে তাকিয়েও দেখে না। যেহেতু এমন চাকচিক্য সে তাকওয়ার খেলাপ মনে করে। যদিও বাড়িতে তার দিকে সে ছাড়া আর অন্য কেউ নজর তোলার নেই।

স্বামী যখন চিল্লায় যায়, তখন সে বাপের বাড়ি চলে আসে। স্বামী তবলীগভক্ত হলেও সে ততটা অথবা মোটেই নয়। তাছাড়া প্রত্যেক ভক্তির একটা সীমা আছে। একটি প্রিয় জিনিসের প্রতি অতিভক্তি যদি অন্য একটি প্রিয় জিনিসের প্রতি অনাসক্তি সৃষ্টি করে, তাহলে তা নিশ্চয় ভাল নয়। কিন্তু স্বামী নিজ স্ত্রীর মন বুঝে না, তার ঈমানের আন্দাজ করে না। নিজের ঈমান তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চায়।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত হলে তাকে বলা হয়েছে, বুঝানোও হয়েছে। এ

গ্রামের মঈনুল দোলাভাই হিসাবে তাকে বুঝিয়েছে, 'এইভাবে তবলীগ করা ঠিক নয়। সংসার-বিরাগী হয়ে তবলীগ শরীয়তে নেই। যে বৈরাগ্যের কারণে পরিজন কষ্ট পায় অথবা স্ত্রী-কন্যা খারাপ হয়ে যায়, সে তবলীগ বাঞ্ছনীয় নয়। তাতে সওয়াব করতে গিয়ে গোনাহ হয়।'

সে বলে, 'দুনিয়া কামানোর জন্য বিদেশে গেলে স্ত্রী-পরিজন খারাপ হয় না, আর আখেরাত কামানোর জন্য গেলেই স্ত্রী-পরিজন খারাপ হয়ে যায়? আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখলে কিছু খারাপ হয় না।'

---ভরসার মানে এই নয় যে, বিনা হিল্লেয় তাদেরকে ছেড়ে যাওয়া হবে। উট বেঁধে তবেই আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে। উট না বেঁধে ভরসা বাঞ্ছনীয় নয়।

---স্ত্রী পরহেযগার হলে কোন ভয় থাকে না।

---আর পরহেযগার না হলে অথবা পরিস্থিতির চাপে পরহেযগারীর বাঁধ ভেঙ্গে গেলে কী হয়? স্ত্রী যদি ঐ বৈরাগ্যে নাখোশ থাকে, তাহলে কী হয়? তাহলে বৈধ কি স্ত্রী-সন্তানের যথার্থ হক আদায় না ক'রে আল্লাহর ইবাদত করা অথবা ইবাদতের উদ্দেশ্যে চল্লিশ-চল্লিশ দিন বা তারও বেশি দিন সংসার ত্যাগ করা?

মহানবী ﷺ (হিজরতের পর মদীনায়) সালমান ও আবূ দার্দার মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করলেন। অতঃপর সালমান (একদিন তাঁর দ্বীনী ভাই) আবূ দার্দার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে (তাঁর বাড়ী) গেলেন। তিনি (আবূ দার্দার স্ত্রী) উম্মে দার্দাকে দেখলেন, তিনি মলিন কাপড় পরে আছেন। সুতরাং তিনি তাঁকে বললেন, 'তোমার এ অবস্থা কেন?' তিনি বললেন, 'তোমার ভাই আবূ দার্দার দুনিয়ার কোন প্রয়োজনই নেই।' (ইতিমধ্যে) আবূ দার্দাও এসে গেলেন এবং তিনি তাঁর জন্য খাবার

তৈরি করলেন। অতঃপর তাঁকে বললেন, 'তুমি খাও। কেননা, আমি রোযা রেখেছি।' তিনি বললেন, 'যতক্ষণ না তুমি খাবে, আমি খাব না।' সুতরাং আবূ দার্দাও (নফল রোযা ভেঙ্গে দিয়ে তাঁর সঙ্গে) খেলেন। অতঃপর যখন রাত এল, তখন (শুরু রাতেই) আবূ দার্দা নফল নামায পড়তে গেলেন। সালমান তাঁকে বললেন, '(এখন) শুয়ে যাও।' সুতরাং তিনি শুয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর আবার তিনি (বিছানা থেকে) উঠে নফল নামায পড়তে গেলেন। আবার সালমান বললেন, 'শুয়ে যাও।' অতঃপর যখন রাতের শেষাংশ এসে পৌঁছল, তখন তিনি বললেন, 'এবার উঠে নফল নামায পড়।' সুতরাং তাঁরা দু'জনে একত্রে নামায পড়লেন। অতঃপর সালমান তাঁকে বললেন, 'নিশ্চয় তোমার উপর তোমার প্রভুর অধিকার রয়েছে। তোমার প্রতি তোমার আত্মারও অধিকার আছে এবং তোমার প্রতি তোমার পরিবারেরও অধিকার রয়েছে। অতএব তুমি প্রত্যেক অধিকারীকে তার অধিকার প্রদান কর।' অতঃপর তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে সমস্ত ঘটনা শুনালেন। নবী ﷺ বললেন, "সালমান ঠিকই বলেছে।"

আর আশা করি আমিও তোমাকে ঠিকই বলছি।'

কিন্তু যার মনের অতল গভীরে একটি বিশ্বাস স্থান পেয়েছে, তা দূর করা অত সহজ নয়। তাই অধিকাংশ সময় জাসমীনা পিত্রালয়েই থাকে।

চোখ আড়, না পাহাড় আড়। কিন্তু চোখের সামনে যে থাকে, সেই হয় কাছের। আবার তার ব্যবহার ও আচরণ যদি মনোমুগ্ধকর হয়, তাহলে বিরহের সে একাকিত্ব দূর হয়ে যায়। ভালবাসার পাতা-ঝরা ডালে নতুনভাবে পাতা গজায়। নব বসন্ত আসে, ফুলে-ফলে সুশোভিত হতে

চায় সেই ডাল।

জাসমীনার সাথে মঈনুলের সম্পর্ক নিবিড় হতে থাকে এবং স্বামীকে নিজ মন থেকে ধীরে ধীরে দূর করতে থাকে। প্রকৃতির নিয়ম এটাই।

'আঁখি মেলি যারে ভালো লাগে
তাহারেই ভালো বলে জানি।
সব প্রেম প্রেম নয় ছিল না তো সে সংশয়
যে আমারে কাছে টানে তারে কাছে টানি।।'

উভয়ের দেখা-সাক্ষাৎ তেমন একটা হয় না। তবে মাঝে-মধ্যে চিঠি আদান-প্রদান করে। আর তার পিয়োন হয় শিহাব। যেহেতু মঈনুলও তার বন্ধু। শিহাবই তাকে কবিতা লিখে দেয়।

জাসমীনা শিহাবকেই বেশী কাছে পায়। মাকে সঙ্গে ক'রে তার মুখে কুরআন শুনতে চায়, গজল শুনতে চায়। তার কণ্ঠস্বরে জাসমীনা বিমোহিতা হয়। শিহাব বাড়িতে এলে অধিকাংশ সেই তাকে বসতে দেয়, ভাত বাড়িয়ে দেয়। মনের অজান্তে কখন তাদের মাঝেও এক প্রকার ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে যায়। যে ভালবাসায় শিহাব জাসমীনাকে পবিত্র ও সতীরূপে দেখতে চায়। তাই সেও ব্যক্তিগতভাবে চিঠি লিখে মঈনুলের ব্যাপারে সতর্ক করে।

প্রকৃতিগতভাবে শিহাব ও মঈনুলের মাঝে ঈর্ষাঘটিত টানাপোড়েন চলে। এক পর্যায়ে গিয়ে দুজনের আপোসে কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যায়। মঈনুল যেহেতু গ্রামের ছেলে, তার অধিকার বেশী ভেবে সে শিহাবকে সরিয়ে পথের কাঁটা দূর করতে চায়। তার বিরুদ্ধে হেড মওলানার কাছে নানা অভিযোগ শুরু করে। কিন্তু প্রমাণ ছাড়া তিনি সে অভিযোগের ভিত্তিতে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন না।

তখন মঈনুল গ্রামের স্কুল-লাইনের বন্ধুদের সহযোগিতা নেয়। তাদেরকে শিহাবের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। যে ছেলেকে দেখে পর্দানশীনরা এখনও পর্দা করে না, সে ছেলের বিরুদ্ধে এমন অপবাদও তারা রটনা করে, যার শাস্তি ইসলামী আদালতে একশ চাবুক।

সুতরাং এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে শিহাব সেখানে নিজেকে অপমানিত বোধ করল। অথচ তার প্রতিবাদ করার মতো কোন ক্ষমতা ছিল না। যেহেতু তার নিজের দুর্বলতাও ছিল। তার নিজ হাতের লেখা নিজের বিরুদ্ধে প্রমাণ হয়ে আছে। সুতরাং পলায়ন ছাড়া আর কোন উপায় থাকল না।

ইল্ম শয়তানের বিরুদ্ধে লড়বার বড় হাতিয়ার। আর প্রত্যেক তালেবে-ইল্ম শয়তান-বিরোধী এক একটি সশস্ত্র যোদ্ধা। অতএব যেনতেনপ্রকারেণ সেই যোদ্ধাকে পরাস্ত করতে কি সে সচেষ্ট না হয়?

ফুল হয়ে ফোটার ইচ্ছা ছিল শিহাবের, কিন্তু কুঁড়ি থাকতেই সে খসে পড়ল বোঁটা থেকে।

যে ফুল থাকিতে কুঁড়ি ঝরে ধরণীতে,
কে পারে তাহার তরে দুঃখ প্রকাশিতে?

(৮)

'আসুক যত বাধা পথে, হারবে না সে কোন মতে।' শিহাব হয়ে উঠেছিল সেই দৃঢ়-সংকল্পের ধুরন্ধর কিশোর। আরবী এত কঠিন হওয়া সত্ত্বেও তার জন্য তা সহজ হয়েছিল। ঘর-ছাড়া হয়ে থাকার কষ্টকেও সে সহজে বরণ করার মতো শক্তি সঞ্চয় ক'রে নিয়েছিল। ইল্মের পথে যত বাধা ছিল, সবকে উল্লংঘন করতে সক্ষম হয়েছিল।

কিন্তু এ এক নতুন বাধা এসে তার পথ আটকে দিল।

এতদিন যে ঘরে খেয়ে সে মানুষ হচ্ছিল, সেই ঘরের মানুষ তাকে বিশ্বাসঘাতক ভাববে, জাসমীনা তাকে ভীরু-কাপুরুষ ভাববে। মাদ্রাসার সকলে তাকে অপরাধী ভাববে। কে বুঝাবে তাদেরকে, তার অপরাধ কী?

মহা অনুতাপে সে ক্লিষ্ট হতে থাকে। বাড়িতে এসে সে কথা সে কাউকেই বলতে পারেনি। গ্রামের লোকেও জানছে, হয়তো বা তার মাদ্রাসায় ছুটি। কিন্তু তা আর কত দিন? 'সুনাম কচ্ছপ গতি, দুর্নাম দুরন্ত।' খবর সত্বর প্রচার হয়ে গেল তার নিজ গ্রামেও। লজ্জায় মুখ দেখানো ভার হয়ে উঠল। তথাকথিত সম্ভ্রান্ত বিরোধীদের কেউ কেউ শুনে বলল, 'আরে সার-গাদায় আবার পদ্মফুল ফোটে?'

না জেনে, না বুঝে কে কত রকমের মন্তব্য ক'রে বসল। তিলকে তাল ক'রে 'পুই' শুনতে 'রুই' শুনে ও প্রচার ক'রে নিজেদের ঈমান খারাপ করল। গরীব ঘরের প্রভাবহীন মা-বাপের ছেলে বলে প্রভাবশালী ধনীদের সেই মন্তব্য ছিল। অথচ তারা জানে অথবা জানে না যে, কয়লার খনিতেই হীরে পাওয়া যায়।

দুঃখে, শরমে নিজের কথা শিহাব কাগজের কাছে জানাল,

সুখের খোঁজে দুখ পাইলে সুখ মিলিল ফের,
দুর্নাম শুধু রটিল আমার অন্তিম নিমেষের।
পূজিয়া তাদের অন্তর আমি বুজিয়া নিজ আঁখি,
দিয়া যাহা কিছু ছিল, রাখি নাই কিছু বাকী।
তাহার বদলে পাইয়াছি শুধু কিংবদন্তি ব্যথা,
আমি সাজিয়াছি চোর, তারা হইয়াছে সাধু সেথা।

হৃদয়-বাগের ফুলের কুঁড়ি ফুটিল না আর মোর,
যাহাদের জন্য করিয়াছি চুরি তাহারাই বলে, 'চোর'।

মসজিদে বসেই তার দিন-রাত্রি অতিবাহিত হয়। মসজিদের ইমাম সাহেব সহৃদ মানুষ। তিনি আসল ঘটনা বুঝে তাকে সান্ত্বনা দেন। তিনি বলেন, 'অন্য মাদ্রাসা চলে যাও। এমন ছোট-বড় এ্যাক্সিডেন্ট প্রায় সব লোকেরই হয়। তা বলে কেউ গাড়ি চালানো বন্ধ ক'রে দেয় না। গাছের পাতা ছাগলে খেয়ে ফেললে গাছটাকেই কেটে কেউ নষ্ট ক'রে দেয় না। গাড়ি সেরে আবার গাড়ি চালাও। গাছে পানি দিয়ে গাছ আবারও উজ্জীবিত কর। জ্ঞানী লোকেরা কখনো পরাজয়ের পর নিরাশ হয়ে অলসভাবে বসে যায় না। তারা চেষ্টা করে ক্ষতিটা পূরণ করতে। পথ চলতে চলতে পড়ে যাওয়াটা বিফলতা নয়, বরং পড়ে থাকাটাই বিফলতা। আর সম্ভবতঃ এই বিফলতাই তোমার সফলতার দ্বার উদ্ঘাটন করবে।'

দুঃখ-ভরা কণ্ঠে শিহাব বলল, 'এ লাইন বড় পবিত্র। একবার কলঙ্কের দাগ লাগলে তা তোলা বড় মুশকিল।'

ইমাম সাহেব বললেন, 'যা মিথ্যা তা কলঙ্ক হতে পারে না। মিথ্যা যেমন চাপা দেওয়া যায় না, তেমনি সত্যকে ঢেকে রাখা যায় না। প্রকৃত রহস্য যখন উদ্ঘাটিত হবে, তখন বদনাম মোচন হবে। লোকের রটিত কলঙ্কের ফলে তুমি নিজের সর্বনাশ করবে কেন? লোকে মানল আর না মানল, তুমি নিজে পবিত্র থাকলেই হল।'

শিহাবের বুকটা 'হু-হু' ক'রে ওঠে। অসৎ সঙ্গীদের সঙ্গ দিয়ে আজ তার কান কাটা গেছে। সেই কান কি আর জোড়া লাগবে? সে লেখে,

আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে আজি

অজয় বাঁধের মত,
প্লাবন আসিয়া প্লাবিত হ'ল
মানুষ-পশু হত।
আর কি যাবে না বাঁধা, লাগিবে না জোড়া
আমার ভাঙ্গা কপাল?
আমি যে অভাগা যে ডাল ধরি
ভেঙ্গে যায় সেই ডাল।
জঙ্গল পথে ভাগ্য বলে
স্বর্ণ লইলাম তুলি,
আমি লোভী হাত খুলে দেখি
শুধু এক মুঠি ধূলি।
সঞ্চিত আশার বঞ্চিত বুকে
চির দুঃখী আমি ধরণীর,
দেখি নাই কভু সুখের স্বপ্ন
হতভাগা আমি জননীর।

সে আব্বা-আম্মার দুঃখ মোচন করতে চেয়েছিল। সে তো তার বদলে তাদের ভাগ্যে আরো দুঃখ এনে দিল। এখন সে কী করবে? সে আবার লিখল,

দুঃখে ভরা জীবন আমার করি কী উপায়,
হারাইয়াছি মোতির মালা খেলতে বাগিচায়।
না চিনেছি সোনা আমি
না জেনেছি কতই দামী
অবহেলায় হারাইয়াছি নদীর কিনারায়।
শৈশব জীবন হতে

কাঁদিতেছি পথে পথে
নিরুদ্দেশ ফিরিতেছি আপনার জ্বালায়।
নাইরে আমার দুখের সাথী
কাটাইব তমস রাতি
একা পড়ে এ দুর্দিনে মরি ভাবনায়।
দুঃখে ভরা জীবন আমার করি কী উপায়,
হারাইয়াছি মোতির মালা খেলতে বাগিচায়।

নির্জনে সে কাঁদে, নামাযে কাঁদে, মায়ের কাছে কাঁদে। অন্ধ-অমানিশায় সে পথ অনুসন্ধান করে। সে ভাবে আর ভাবে, 'কোন্ দিকেরে বাইব তরী, অকূল কালো নীরে?'

ওগো পথিক বিহারী তুমি কি দিশারী
এ তিমির নিশিথ পথে?
চলিয়াছ একা মনে লাগে ধোঁকা
লণ্ঠন লয়ে হাতে।
ইহা শুধু নহে রজনীর নিয়মিত প্রকৃতির
বর্ষা মেঘের যৌথ অন্ধকার,
আমি হারাইয়াছি দিশা এ ভয়াবহ নিশা
কি উপায়ে হ'ব বল পার?
হে প্রভু আপন দয়ায় দয়াল তুমি দীনের সহায়
পথ দেখাইয়া দাও,
অভাগার পড়িয়াছে রাত্রি হইয়াছে সে অন্ধযাত্রী
সখা তুমি সঙ্গে ক'রে নাও।

ইমাম সাহেব আবারও বলেন, 'শিহাব! তুমি শয়তানকে বিজয়ী করো না। তোমার এ কাজে শয়তান বড় কৃতার্থ ও খোশ হবে। তাকে

পরাজিত করতে আবার নতুন ক'রে অগ্রসর হও। যা হয়ে গেছে, তা বয়ে যেতে দাও।'

শিহাবের মনে মাদ্রাসায় পড়ার আগ্রহ পুনর্জাগরিত হয়। জীবনের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে এবারে সতর্কতার সাথে পথ চলার সিদ্ধান্ত নেয়।

(৯)

যদিও শিহাব ধোওয়া ফুল, তবুও শহরের এ মাদ্রাসায় সে তরতাজা। যেহেতু এখানে তার বদনামের খবর পৌঁছেনি। তবে উঠতি বয়সে খারাপ ছেলেদের সাথে মিশে সে যে ভুল করেছে, তার তুলনায় অন্য অনেক ছাত্র আরো বেশি ভুল কাজ করে। আর তা যদি তাদের সাদা কাপড়ে দাগ না লাগে, তাহলে তারই বা লেগে থাকবে কেন?

এ মাদ্রাসা থেকে আরব যাওয়া যায়। আসলে সেটা একটা 'জামেআহ'। তাই এখানে থেকে সদা-সর্বদা সে আরব যাওয়ার স্বপ্ন দেখতে লাগল। এখন সে 'ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে থাকে, লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখে।' জামেআর প্রায় সকল ছাত্ররাই দেখে। তবে একই ক্লাসে কর্তৃপক্ষের ভাইপো-ভাগিনা থাকলেই মুশকিল। কারণ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোন 'ফার্স্ট্-বয়' টিকতে পারবে না। যে দেশের সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি আছে, সে দেশের স্কুল-মাদ্রাসায় দুর্নীতি থাকবে না কেন?

এখানে অনেক ছেলে প্যান্ট্-শার্ট পরে, তাতে নাকি ইসলামের কোন বাধা নেই।

অনেক ছাত্র দাড়ি চাঁছে অথবা ছাঁটে, তা নাকি ইসলামের কোন জরুরী বিষয় নয়।

অনেক ছাত্র লুকিয়ে সিনেমা দেখে আসে, তা নাকি তাদের 'দিল হ্যায় কে মানতা নেহী!' কর্তৃপক্ষের নিষেধ উল্লংঘন ক'রেও তারা সে বিলাসিতা বর্জন করতে পারে না। রাত দশটার পর মেনগেট বন্ধ ক'রে দিলেও তারা শহরের কোন মসজিদে রাত কাটিয়ে সকালে জামেআয় ফিরে আসে!

অধিকাংশ ছাত্র তামাক-জাতীয় দ্রব্য ব্যবহার ও সেবন করে। সেগুলোও নাকি ইসলামে মকরূহ! এ পীড়ায় অনেক মুদার্রিসও পীড়িত।

ইত্যাকার আরো বহু শরীয়ত-বিরোধী কর্মকান্ড দেখে শিহাবের মন বিষিয়ে উঠতে লাগল। যে সরষেয় ভূত ছাড়বে, সেই সরষেতেই ভূতের আড্ডা দেখে বিস্মিত হল!

সেই পরিবেশে থেকে বছর ঘুরে গেল। এখানেও সে ভাল রিজাল্ট্ করল। ভাল সাথী-সঙ্গী লাভ করল। মনের মতো একজন মাদানী আলেমও পেল সে।

তাঁর কাছে মনের কথা খুলে বলতে লাগল। মনের দুঃখ প্রকাশ করতে লাগল। এক রাত্রে কথায় কথায় সে তাঁকে বলল, 'লোকেদের সাদকা-ফিতরা খেয়ে এই শ্রেণীর আলেমরূপী যালেম তৈরি ক'রে সমাজের কী উপকার হবে জী?'

তিনিও বড় দুঃখ প্রকাশ ক'রে বললেন, 'শিহাব! এ সব দেখে-শুনে মন খারাপ হওয়ারই কথা। তবে তাদের দিকে দৃষ্টি তুলে নিজের দৃষ্টিকে নাপাক না ক'রে নিজেকে রব্বানীরূপে প্রতিষ্ঠিত কর। বছরে অথবা পাঁচ বছরেও যদি লাখে একটি আলেম এই কারখানা থেকে তৈরি হয়, তাহলেই আমাদের শ্রম ও প্রচেষ্টা সার্থক। মাদ্রাসায় পড়িয়ে মানুষ

করার কারবার যেন সোনার জন্য মাটি খোঁড়ার মত। এক আউন্স সোনার জন্য টনের পর টন মাটি কাটতে ও সরাতে হয়। তাতে যে সোনাটুকু বের হয়, সেটুকুই লাভ।'

'হাযারুঁ সাল নার্গিস আপনী বেনূরী পে রোতী হ্যায়,
বড়ী মুশকিল সে হোতা হ্যায় চমন মেঁ দীদাহঅর পয়দা।'

(অর্থাৎ, হাজার-হাজার বছর ধরে নার্গিস ফুল নিজ সৌন্দর্যহীনতার জন্য রোদন করে। বড় মুশকিলে বাগানে দেখার মতো ফুল জন্ম নেয়।)

শিহাব হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসল, 'জী! রব্বানী হতে গেলে কী হওয়া বা করা দরকার?'

মওলানা বললেন, 'রব্বানী হওয়া মানে আল্লাহ-ওয়ালা, মুত্তাক্বী বা পরহেযগার হওয়া। ইল্ম অনুযায়ী আমলকারী হওয়া। দ্বীনী ইল্মের ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে দুনিয়া শিকার না করা। দুনিয়ার বিনিময়ে দ্বীনকে বিক্রয় না করা ইত্যাদি।'

---কিন্তু জী! আমরা তো চাকরির আশাতেই পড়াশোনা করি।

---ভুল সেটা। নিয়ত বদলে ফেলো। লোকে ওশর-যাকাত মাদ্রাসায় দেয় দ্বীনকে বাঁচানোর জন্য, তোমার সরকারী চাকরি করার জন্য নয়।

---তাহলে পেট চলবে কীভাবে?

---আলেম হিসাবে তোমার প্রধান দায়িত্ব হবে দ্বীন বাঁচানো। রুযী-রুটির জন্য একটা কাজ তো করতেই হবে। তোমার প্রধান চিন্তা যেন দুনিয়া না হয়।

---বুখারী পড়ানোর মতো যোগ্য আলেমরা সরকারী চাকরি নিয়ে স্কুলে ঢুকে যাচ্ছেন, তাঁদের ব্যাপারে বক্তব্য কী?

---দ্বীন ধ্বংস করার এক সুন্দর ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি, মৌলবাদ ও

সন্ত্রাস-দমনের একটি সুন্দর উপায়। রুটি দিয়ে মুখ বন্ধ রাখার অপূর্ব কৌশল।

---তাহলে দ্বীন রক্ষা করার উপায় কী?

---আল্লাহর দ্বীন আল্লাহই রক্ষা করবেন। সরকারী চাকরি কি সব যুগেই সহজলভ্য থাকবে? রব্বানী আলেম নিশ্চয় থাকবেন। একটা হাদীস শোনো, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তির প্রধান চিন্তা (লক্ষ্য) ইহলৌকিক সুখভোগ (দুনিয়াদারীই) হয়, আল্লাহ তার প্রচেষ্টাকে তার প্রতিকূলে বিক্ষিপ্ত ক'রে দেন, তার দারিদ্র্যকে তার দুই চক্ষুর সামনে ক'রে দেন, আর দুনিয়ার সুখসামগ্রী তার ততটুকুই লাভ হয়, যতটুকু তার ভাগ্যে লেখা থাকে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির উদ্দেশ্য (ও পরম লক্ষ্য) পারলৌকিক সুখভোগ (আখেরাতই) হয়, আল্লাহ তার প্রচেষ্টাকে তার অনুকূলে ঐকান্তিক ক'রে দেন। তার অন্তরে অমুখাপেক্ষিতা (ধনবত্তা) ভরে দেন। আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুনিয়ার (সুখসামগ্রী) তার নিকট এসে উপস্থিত হয়।"

(১০)

দিন কেটে যায়। শিহাবের দিন কাটে বড় কষ্টে। জামেআর খাবার মোটেই ভাল নয়। খিদে ছাড়া মুখ থেকে গলায় নামে না। দু-বেলা খাবারে কাঁচা পিঁয়াজ-মরিচই ভরসা। খরচ করার মতো টাকা হাতে থাকে না। গত পৌষ মাসে ধান বিক্রি ক'রে আব্বা একটি হাতঘড়ি কিনে দিয়েছে। কাপড়-চোপড়, তেল-সাবানেও পয়সা খরচ আছে। সুতরাং খাবারে অতিরিক্ত ব্যয় করার মতো তার পয়সা কোথায়?

যারা বড়লোকের ছেলে, তারা স্পেশাল বানিয়ে অথবা কিনে খায়।

গরীব হয়েও যারা ব্যক্তিগতভাবে হাত পাততে পারে, তারাও ভাল খায়, ভাল থাকে। কিন্তু তার মতো গরীব ছাত্রদের উপায় কী?

কোন কাজ জুটলেও হয়। এমন কাজ, যাতে পড়াশোনার কোন ক্ষতি না হয়। তেমন কাজই বা কোথায় পাওয়া যায়?

বাজার দিয়ে খুব একটা বেড়াতে যায় না শিহাব। কোনদিন গেলে এবং কোন জিনিস খেতে মন চাইলে খেতে পারে না। মায়ের পরনে ছেঁড়া শাড়ি ও ভাই-বোনের পরনে ছেঁড়া পোশাক মনে পড়ে যায়। ফলে সে পয়সা খরচ ক'রে মা-বাপের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে না। কেউ কিছু খাওয়াতে গেলেও বিনিময়ে সে খাওয়াতে পারবে না বলেই খেতে চায় না। সাথীরা তাকে বখীল বলে। অথচ সে বখীল নয়, বরং ফকীর। আসলে সে এমনভাবে থাকে, যাতে তাকে দরিদ্র বলে মনে হয় না। যদিও দরিদ্রতা কোন ত্রুটি নয়; তবুও তা গোপন রাখাই ভালো। তবে গরীব হয়েও নিজেকে ধনী জাহির করা ভালো নয়।

দেহে যাদের অপুষ্টিকর খাদ্য, মাথায় যাদের দারিদ্র্যের দুশ্চিন্তা, তাদের 'মনুষ্যমেধা' কি লালিত হতে পারে? পেটে ক্ষুধার জ্বালা রেখে কেউ কি বিচক্ষণ হতে পারে?

যাদের প্রতিভা আছে, কিন্তু সে প্রতিভার লালন নেই, সে প্রতিভার পশ্চাতে কোন অনুপ্রেরণা নেই, সে প্রতিভার কুঁড়ি কি সেচ অভাবে ফুলের কুঁড়ি ঝরে পড়ার মতো অকালে ঝরে পড়বে না?

অন্ধদের স্মৃতিশক্তি অসাধারণ, তবুও এ দেশের অন্ধরা দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করতে করতে জীবন দেয়। কিন্তু যে দেশে সেই স্মৃতিশক্তির ইসলামী লালন আছে, সে দেশে কোন কোন অন্ধের মাসিক বেতন প্রায় চার লক্ষ টাকা।

শিহাব উস্তাদের নিকট থেকে এসব কথা শোনে। ইসলাম ও মুসলিমদের দুর্বলতার কারণ নির্ণয় করতে চায়। 'ফিদ্দুন্য়া হাসানাহ, অফিল আ-খিরাতি হাসানাহ' লাভের উপায় আবিষ্কার করতে চায়। উস্তাদদের সঙ্গে আলোচনা করে, সহপাঠীদেরকে নিয়ে রাত্রে পঠিত পাঠের পুনরালোচনা করে। আগামী কালের পড়ায় আগাম নজর বুলিয়ে রাখে। এতে তার ব্যুৎপত্তি বৃদ্ধি লাভ করে। দুর্বার গতিতে সে লক্ষ্যপথে এগিয়ে চলে। শত দুঃখ-ক্ষতে পটি বেঁধে ইল্মী জিহাদের পথে অবিচল থাকে।

সকালে হাদীসের ক্লাশে পরহেযগার মুহাদ্দিস সাহেব হাদীস পড়াচ্ছিলেন। তিনিও একজন দরিদ্র আলেম। তাঁর ব্যাখ্যায় ছিল দ্বীনী দরদ ও নবী-প্রীতির স্পষ্ট আলো।

একদা এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কসম! আমি নিঃসন্দেহে আপনাকে ভালবাসি।' তিনি বললেন, "তুমি যা বলছ, তা চিন্তা ক'রে বল।" সে বলল, 'আল্লাহর কসম! আমি নিঃসন্দেহে আপনাকে ভালবাসি।' এরূপ সে তিনবার বলল। তিনি বললেন, "যদি তুমি আমাকে ভালবাসো, তাহলে দারিদ্র্যের জন্য বর্ম প্রস্তুত রাখো। কেননা, যে আমাকে ভালবাসবে, স্রোত তার শেষ প্রান্তের দিকে যাওয়ার চাইতেও বেশি দ্রুতগতিতে দারিদ্র্য তার নিকট আগমন করবে।"

তিনি এই হাদীসের ব্যাখ্যা বড় আবেগের সাথে শুনাচ্ছিলেন। এমন সময় এক চাপরাসি এসে খবর দিল, 'শিহাব অফিস রুমে এসো, তোমার টেলিফোন এসেছে।'

ফোন ধরতেই শুনতে পেল তার এক চাচাতো ভাইয়ের কণ্ঠস্বর। সত্বর জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার?'

---চাচা একজনের বাড়িতে টিন পিটাতে গিয়েছিল। চাল থেকে পড়ে গেছে। আমরা তাকে এখন বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি।

শিহাবের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। সহসাই তার চোখ দু'টি থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল। অতি শীঘ্র প্রিন্সিপালের নিকট ছুটি নিয়ে প্রথম ট্রেনেই বর্ধমান রওনা দিল।

শত দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে হাসপাতালে যখন পৌঁছল, তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। হাসপাতালের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। সেই সকাল ছাড়া আর দেখার উপায় নেই। বহু চেষ্টা করেও ভিতরে যাওয়া গেল না। যারা সঙ্গে এসেছিল, তারা সবাই বাড়ি ফিরে গেছে। হয়তো বা আম্মা আছে আব্বার সাথে।

বড় কষ্টের সাথে রাত্রি কাটিয়ে সকালে ভিতরে প্রবেশ-অনুমতি পেলে খুঁজে দেখল, আব্বার নাকে অক্সিজেন লাগানো আছে। বুকে ই.ই.জি. ও ই.সি.জি. যন্ত্র। মাথায় আঘাত লেগেছে, তাতে ব্যান্ডেজ করা আছে। হাতে স্যালাইন লাগানো আছে। জ্ঞানশূন্য অবস্থায় বিন্দু-বিন্দু ক'রে তার দেহে ওষুধ ও খাবার সঞ্চালিত হচ্ছে। আর শিয়রে নিরাশ অবস্থায় অভাগিনী মা তার মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে, তার চোখ বেয়ে বিন্দু-বিন্দু ক'রে অশ্রু ঝরে পড়ছে।

তাকে দেখে মা সশব্দে কেঁদে উঠল। সারা রাত্রি জাগরণ করেছে শুধু এই আশাতে যে, তার জ্ঞান ফিরে আসবে। কিন্তু না। ইতোমধ্যে একজন নার্স এসে বলল, 'এ রোগীর রক্ত লাগবে। রক্ত নিয়ে আসুন। রক্ত না দিলে রোগী বাঁচানো যাবে না।'

শিহাব বলল, 'হাসপাতালে রক্ত নেই?'

---না। কিনে আনুন। নচেৎ একই গ্রুপের কোন লোককে নিয়ে আসুন।

মায়ের স্বাস্থ্য এমনিতেই ভাল নয়। শিহাবের স্বাস্থ্যও সেই মাদ্রাসার এক তরকারি ভাতের সাথে কাঁচা পিঁয়াজ ও মরিচ খাওয়া। তবুও সাহস ক'রে সে নিজের গ্রুপ-টেস্ট্ করালো। কিন্তু মিলল না। হাতে টাকাও নেই, যা দিয়ে রক্ত কেনা যাবে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে শিহাব ছুটাছুটি করতে লাগল।

বাইরে একজন বয়স্ক লোক তার নাজেহাল অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে বাবা!'

সে ঘটনা খুলে বললে লোকটি বলল, 'এখানে টাকা ছাড়া কিছু মিলবে না বাবা!'

শিহাব বলল, 'আমার কাছে তো টাকা নেই। তবে আমার এই হাতঘড়িটা আছে। এখনও নতুন, এটা যদি কোথাও বিক্রি করা যায়।'

লোকটি দরদ দেখিয়ে বলল, 'ঠিক আছে। তোমার ঘড়িটা দাও, আমি ব্যবস্থা করছি। তুমি বরং রোগীর কাছে গিয়ে বস, আমি আসছি।'

অনভিজ্ঞ সরল মনে শিহাব ঘড়িটা তার হাতে তুলে দিয়ে ভিতরে আব্বার কাছে গিয়ে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'রক্ত আনতে দিয়েছি, এক্ষনি চলে আসবে।'

---কাকে আনতে দিলি বাবা?

---একজন বয়স্ক লোককে। দয়া দেখিয়ে সে বলল, 'তুমি রোগীর কাছে যাও, আমি রক্ত নিয়ে আসছি।'

গরীবের প্রতি দয়া করবে একজন পথচারী? একি উমারের রাজত্ব নাকি? ঘন্টার পর ঘন্টা পার হয়ে গেল, দয়াবান লোকটি আর ফিরে এল না।

নার্স বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগল। শেষবারে একটি প্রেস্ক্রিপশন ধরিয়ে বলল, 'এই ইঞ্জেকশনটা তাড়াতাড়ি নিয়ে আসুন। এক্ষনি লাগবে।'

টাকা কোথায়? মা কানের জিনিস খুলে দিয়ে বলল, 'এ দুটো কোথাও বিক্রি ক'রে ইঞ্জেকশন নিয়ে আয় বাবা!'

এবারে শিহাব সশব্দে কাঁদতে লাগল। বর্ধমানের পথ-ঘাট সে তেমন চেনে না। জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে অশ্রুভরা ঝাপসা চোখে সোনার দোকানে গিয়ে অলংকার বিক্রি ক'রে ফার্মেসি থেকে ইঞ্জেকশনটি নিয়ে যখন আব্বার কাছে ফিরে এল, তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। ইতোমধ্যে গ্রাম থেকে চাচী-সহ আরো কয়েকজন আত্মীয় এসে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু তার আগে তার আব্বার আত্মা সকলের নিকট থেকে চির বিদায় নিয়ে চলে গেছে।

তকদীরের সাথে কোন লড়াই নেই। আল্লাহর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহর ফায়সালার কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে শিহাব মাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। কিন্তু সেই বা কী বলে সান্ত্বনা দেবে, যার নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো কিছু নেই।

গাড়ি ভাড়া ক'রে লাশ নিয়ে গ্রামে ফিরে এল। সারা গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এল। ধার ক'রে গাড়িভাড়া মিটানো হল। এল দাফন-কাফন ও আত্মীয়-স্বজনদের আপ্যায়নের পালা।

শিহাব মোকামী জামাআতকে সে দায়িত্বভার অর্পণ করল। চাকরি-ওয়ালা চাচা সে খরচভার বহনের দায়িত্ব নিতে চাইল ভাবীর কাছে।

কিন্তু শিহাব সাফ জানিয়ে দিল চাচার একটি পয়সাও যেন তাতে লাগানো না হয়। যে মানুষের জীবদ্দশায় একটি পয়সা জানে না, হাসপাতালে ভরতি করার সময় একটি পয়সা জানে না, অথচ পয়সার অভাবে রক্তস্বল্পতায় যে মারা গেল, সে মানুষের মরণের পর আবার দরদ কীসের? তার মরণের পর কেন তার জন্য টাকার সাহায্য নেবে?

কিন্তু এ ব্যাপারে মা দুর্বলতার শিকার হল। তার ধারণা ছিল পরবর্তী জীবনে সে হয়তো দেখাশোনা করবে। যেহেতু এখন বাড়ির গার্জেন বলতে সেই তো। কিন্তু শিহাব কোন মতেই দুর্বল নয়। ছোট ছোট এতীম ভাই-বোনকে জড়িয়ে ধরে সে কেঁদে কেঁদে বলে উঠল, 'আমাদের জন্য আল্লাহ আছেন। অতঃপর আমার মায়ের তুল্য গাঁয়ের লোকজন আছে।'

এ কথায় শিহাবের মামা ও খালুরা সমর্থন করল। ফলে স্বার্থপর চাকরি-ওয়ালা চাচা কুনো ব্যাঙের মতো ঘরে প্রবেশ করল। লোকেরা মনে মনে তার গায়ে থুথু দিল। সে ছিল প্রকাশ্যে থুথু খাওয়ার যোগ্য।

যথাসময়ে দাফনকার্য শেষ হয়ে গেল। শোক-সন্তপ্ত মনে শিহাব তার আব্বাকে মাটির আলয়ে সমাহিত ক'রে বাড়ি ফিরে এল।

(১১)

প্রায় এক সপ্তাহের মতো বাড়িতে থাকল শিহাব। পড়াশোনার ক্ষতি হলেও বিধবা মায়ের চলার মতো কোন ব্যবস্থা না ক'রে সে জামেআয় ফিরতে পারত না।

গ্রামের দূর সম্পর্কের এক বিধবা ফুফু শান্তিনিকেতনের শাড়ির উপর ফুল বা নক্সা করার কাজ করে। তারই পরামর্শ ও সহযোগিতা অনুসারে

মা শাড়ির কাজে লেগেছে। এক রাতে দেরীতে বাড়ি ফিরে শিহাব দেখল, তখনও তার মা হ্যারিকেনের আলোতে শাড়ির কাজ করেই যাচ্ছে।

শিহাব মৃদু হেসে বলল, 'তোমার এই ছোট্ট সুচ দিয়ে কি দারিদ্র্যের মতো ডাইনোসরের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় মা গো?'

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'যতটা পারি, ততটা করি বাবা! এ ছাড়া বড় হাতিয়ার কি আছে আমাদের?'

শিহাব বলল, 'তা অবশ্যই নেই। তবে আল্লাহর কাছে আমি বড় আশা রাখি। ঐ রাক্ষসকে আমি অবশ্যই হত্যা করে ছাড়ব।'

---আল্লাহ তাই করুক বাবা!

শিহাব একটু মুচকি হেসে বলল, 'যারা তোমার এই শাড়ি পরবে, তারা কি জানবে যে, বিলাসভরা এই শাড়ির যে নক্সা করেছে, তার পরনের শাড়ির অবস্থা কী?

---তা জানার প্রয়োজন কি তাদের আছে বাবা?

---তা হয়তো নেই। এ দুনিয়ায় সবাই স্বার্থপর মা! ঘরের লোকে অবস্থা জানতে চায় না, তখন পরের লোকে কেন জানতে আসবে?

---শুনেছিস? তোর চাচা হজ্জ করতে যাবে।

---যেতেই পারে। তাতে যে সুনাম আছে। 'হাজী-সাহেব' ডাক শুনে মনের তৃপ্তি আছে।

---ওসব বলিস না বাবা! নিয়তের কথা কেউ কি বলতে পারে?

---স্পষ্ট। যারা বাড়ির পাশে নিজ গরীব নিকটাত্মীয়দের খোঁজ নেয় না, তারা যাবে দূর আরবে মক্কায় হজ্জ করতে। কোন্ মুখ নিয়ে তারা 'লাব্বাইক' বলবে মা? খবরদার মা! টাকা-পয়সা বা অন্য কিছু দিতে

এলে তা নিয়ে নিজেকে ছোট করবে না। আব্বার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে, তা আমরা ভুলতে পারব না।

বড় ভাই হিসাবে যতটুক করার সাধ্য ছিল চাচার পড়াশোনা ও চাকরির ব্যাপারে শিহাবের আব্বা তার সহযোগিতা করেছে। কিন্তু চাকরি পাওয়ার কিছুদিন পর সংসার থেকে পৃথক হয়ে সে তাদের পর হয়ে গেছে। আর যে পর হয়ে গেছে, সে যদি স্বার্থপর হয়, তাহলে সে আর কোনদিন ঘর হতে পারে না, বিশেষ ক'রে যখন ঘর হতে এসে টাকার অপচয় হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

শিক্ষিত বা আলেম হয়েও শিক্ষিত বা আলেম বড় ভাইয়ের প্রতি অনেকে শ্রদ্ধা রাখে না, আর শিহাবের আব্বা তো অশিক্ষিত। অতএব শিক্ষিত ভাইয়ের কাছে কি মূর্খ ভাই সে শ্রদ্ধার আশা করতে পারে? যদিও শিক্ষিত অশিক্ষিতের কাছে নানাভাবে ঋণী।

ঋণ নিয়ে মানুষ ভুলে যায়। নেমক খেয়েও মানুষ নেমকহারামি করে। স্বার্থের তরে ঘর পর হয়ে যায়। কাছের মানুষ দূর হয়ে যায়। তাদের মনে থাকে হিংসা, আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা।

নদী পার হয়ে লায়ের মাঝি 'শালা' হয়ে যায়। স্বার্থ ফুরিয়ে গেলে মানুষ দূরে সরে যায়। যতদিন পায়, ততদিন ধায়, পাওয়া শেষ হলে ফিরে নাহি চায়। দুনিয়ার এ দুর্নীতি প্রায় সব সংসারেই আছে। মানুষের এ প্রকৃতি না হলে, সে নিজ সৃষ্টিকর্তাকে ভুলত না।

শিহাব মাদ্রাসায় পড়ছে। সে ব্যাপারে কোন খোঁজ-খবর রাখে না। অথবা মাদ্রাসায় পড়াকে ঘৃণা করে। বেতন দিতে না পারায় তার যে বাংলা পড়া গেছে, তার খবরও হয়তো চাচা জানে না।

চাচার ব্যবহারের কারণে আব্বা বড় কষ্ট পেয়েছে, যত কষ্ট আপন

পর হলে পাওয়া যায়। তবুও আব্বা তাকে পুনরায় আপন করার চেষ্টা করেছে। 'ভাইয়ের ভাই, মেরে গেলে ফিরে চাই।' তার বিপদে-আপদে আব্বা সাথ দিয়েছে। কিন্তু চাচা ভেবেছে, সে হয়তো আপন স্বার্থে অথবা কর্তব্য পালনে তা করেছে। আব্বার আঘাতপ্রাপ্ত মানসিক অবস্থা যেন বারবার গেয়েছে,

'আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যে-বা, আমি বাঁধি তার ঘর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।
যে মোরে করিল পথের বিবাগী,
পথে পথে আমি ফিরি তার লাগি;
দীঘল রজনী তার তরে জাগি ঘুম যে হরেছে মোর;
আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যে-বা, আমি বাঁধি তার ঘর।'

একজন গরীব ছেলের পড়াশোনা করায় কত যে কষ্ট, তা হয়তো অনেকে জানে না। তারা হয়তো ভাবে, মাদ্রাসার ফ্রি থাকা-খাওয়া, বাকী সব কিছুও ফ্রি। সুতরাং মাদ্রাসা-পড়ুয়া ছাত্রদের খোঁজ নিয়ে কী হবে?

অথচ যদি আল্লাহর হকও তাদেরকে প্রয়োজনে দেয়, তাহলে দ্বীনের উপকার সাধন হয়। কিন্তু তাদের সে ভরসা থাকে না, তাই গুরুত্ব দেয় না। কেউ কি আর বুঝতে পারে যে, এই তালেবে ইল্ম একদিন নাম করা আলেম হবে?

মসজিদের ইমাম সাহেব সব বাড়ির খবর রাখেন। তিনি গরীব বলেই গরীবদের প্রতি সদয় হন। একদিন গোপনে গ্রামের এক ধনীর কাছে আবেদন রাখলেন, 'শিহাব গরীবের ছেলে। মাদ্রাসায় পড়ছে। তার বই-পত্র ও হাত-খরচের জন্য কিছু সাহায্য করতে পারলে করুন। আল্লাহর

কাছে আপনার ভালা হবে।'

উত্তরে সে বলল, 'চায় না তো কী দেব? চাইলে দেব!'

ইমাম সাহেব মৃদু হেসে বললেন, 'ও চাইতে লজ্জা করে।'

ধনী বলল, 'লজ্জা করলে আবার আলেম হতে পারে নাকি?!'

পরবর্তীতে সে তার ছেলের হাতে একটি মাত্র টাকা পাঠিয়ে দিল। অবশ্য শিহাব তা গ্রহণ করেনি।

পরে ঐ ধনী বলতে লাগল, 'কিছু দিতে গেলেও নেয় না। অহংকার কত!'

পক্ষান্তরে যারা হাত পেতে চায়, তারা পায়। অথচ তাদের অনেকেই পাওয়ার হকদার নয়।

ইমাম সাহেবের প্রচেষ্টায় আরো এক ধনী শিহাবকে সমস্ত হাত-খরচ দিতে রাজী হয়। কিন্তু তার শর্ত ছিল, আলেম হওয়ার পরে তাকে তার জামাই হতে হবে।

শিহাব এমনভাবে নিজেকে বিক্রি করতেও চায়নি।

বিধায় তাকে আশাবাদী, আত্মবিশ্বাসী ও স্বনির্ভরশীল হতে উদ্বুদ্ধ করলেন ইমাম সাহেব। বর্তমানে সে শহরের মাদ্রাসায় পড়ে। সে ইচ্ছা করলে দু-একটা টিউশনিও করতে পারে। তাতে কিছু হাত-খরচা আসবে। সেই আশাতেই সে আল্লাহর নাম নিয়ে জামেআয় ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করল।

তবুও মা বলল, 'তুই মাদ্রাসায় ফিরে যা। আমি শাড়ি ক'রেই তোর জন্য আগের মতোই টাকা পাঠাব। তোকে বড় হতেই হবে বাবা!'

বিদায়ের দিন শিহাব সবারই নিকট থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। ছোট্ট বোনটি দৌড়ে এল তার কাছে। পাঞ্জাবীর খুঁট ধরে

দাঁড়িয়ে বলল, 'ভাইয়া! তুমি চলে যাচ্ছ? আব্বু কবে আসবে ভাইয়া?'

কচি মুখের কাঁচা কথা শুনে শিহাব তাকে কোলে তুলে নিয়ে চুমা দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কেঁদে উঠল তার ছোট ভাইটিও। আর তার মা অভাগিনী তো আগে থেকেই কাঁদছিল। তাদের দেখাদেখি কেঁদে উঠল প্রতিবেশীর উপস্থিত মহিলারা।

যাবার সময় বলে গেল, 'বিদায়ের সময় কাঁদালি বোনটি! আমি তোর জন্য সর্বক্ষণ কাঁদব রে!'

দুঃখিনী মা বলল, 'এবারে তোর হাতে টাকা-পয়সা দিতে পারলাম না বাবা! মাসখানেকের ভিতরে মনি-অর্ডার ক'রে দেব।'

শিহাব মায়ের মাথা চুম্বন ক'রে বলল, 'আমার সাথে তোমার দুআ থাকলেই আমার অভাব হবে না মা! তুমি আমার জন্য দুআ করো।'

---তুই অনেক বড় হ বাবা!

(১২)

জামেআয় ফিরে তার এত বড় দুঃখের কথা জেনে সকলে দুঃখিত হয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। সদয় হয়ে এক বন্ধু তাকে একটি ঘড়ি কিনে দিল। একজন তাকে একটি টেরিকটের জামা উপহার দিল। এই ছিল তার জীবনের প্রথম উন্নত জামা। সুহৃদ বন্ধুদের সহযোগিতায় সে বড় কৃতজ্ঞ হল।

শায়খুল জামেআহ তাকে ফতোয়া নকলের কাজ দিলেন। লাইব্রেরিয়ানরূপেও কিছু মাসোহারার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। সেই সাথে শহরের বন্ধুদের সহযোগিতায় দু'টি টিউশনিও যোগাড় হয়ে গেল। যখন বিধি মাপায়, তখন উপরি উপরি চাপায়। আল্লাহর রহমতে সে

তখন বাড়িতে অভাগিনী মায়ের জন্য টাকা পাঠাতে লাগল।

সেই সময় মায়ের অবস্থাও করুণ ছিল। তার শাড়ির কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যেহেতু তার জন্য তাকে শহরে গিয়ে পুরুষদের কাছে ট্রেনিং দিয়ে আসতে হতো। কিন্তু লজ্জাশীলা তা পারেনি বলে তাকে কাজ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ যে সহায়-সম্বলহীনের কল্যাণ চান, তিনি তার এমন সহায় সৃষ্টি ক'রে দেন যে, তাকে পেয়ে সে ধন্য হয়। তার পুরনো আঘাত-অভিঘাতের ব্যথা সে ভুলে যায়। তিনি যে প্রদীপ উজ্জ্বল রাখার ইচ্ছা করেন, সে প্রদীপের রক্ষক সমীরণকেই বানিয়ে দেন। তিনি যে কলাইয়ের পেষণ চান না, সে কলাইকে যাঁতা-কাষ্ঠের ধারে লাগিয়ে দেন। তিনি যে ডুবন্ত মানুষের জীবন চান, তার কাছে জেলের ডিঙি পাঠিয়ে দেন।

যারা আল্লাহর উপর ভরসা রাখে, আল্লাহ তাদের পথ সহজ ক'রে দেন। মায়ের দুআ লাগলে উপায় বের হয়ে আসে। ধীরে ধীরে টিউশনি-বাড়ির লোকেরাও শিহাবের আপন হতে লাগল।

তবে 'চুন খেয়ে গাল তেঁতেছে, দই দেখিয়াও ভয় হয়।' জলাতঙ্কের রোগী জলে কুকুর দেখে। জায়গিরি-বাড়ির এক প্রেমময়ী যুবতীর সাথে দুর্নাম রটার কথা তার মনে হতে লাগল। সুতরাং ধাক্কা খেয়ে শিক্ষা পেয়ে অতি সন্তর্পণে সে ছাত্রী পড়াতে লাগল।

জামেআর খাবার ভাল নয়। এ খবর টিউশনি-বাড়ির কর্ত্রী জানতে পারলে তাকে প্রত্যহ একটি ক'রে তরকারি টিফিন-কেসে ভরে দিতে লাগল। খাবারের কষ্টও আর থাকল না শিহাবের।

একদিন খাবার নিয়ে জামেআয় গন্ডগোল বাধল। ছেলেরা কেউ ভাত

খাবে না। প্রিন্সিপালের কাছে খবর গেলে তিনি কারণ জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে পারলেন, 'তরকারি ভাল নয় তাই।' সাথে সাথে তিনি সেক্রেটারি-সভাপতিকে ফোন করলেন। তাঁরা এলে শুরু হল তুলকালাম। 'তোমরা মাদ্রাসায় পড়তে এসেছ, লোকের ওশর-যাকাত খেয়ে প্রতিপালিত হচ্ছ, তাতে তোমাদেরকে খাসির মাংস খাওয়াতে হবে নাকি?'

ছাত্রেরা বলল, 'আমরা খাসির মাংস চাই না, গরুর মাংসও চাই না। কিন্তু আমাদেরকে গরু ভাবা হোক, সেটাও আমরা চাই না।'

পরিশেষে একটি বুঝাপড়া ও সালিসির মধ্যে এসে সপ্তাহান্তে একদিন মাংস দেওয়ার রেওয়াজ চালু হল এবং সব্জিতে অতিরিক্ত তেল-মসলা বরাদ্দ করা হল।

জামেআর জীবনে আরো অনেক কষ্টকে বরণ ক'রে নিতে হল শিহাবকে। লোডশেডিং হলে গরমে কষ্ট হয়, ছাদে গিয়ে ঘুমাতে হয়, চাঁদের আলোয় পড়তে হয়, দূরে গিয়ে গোসল ক'রে আসতে হয়।

দ্বীনের খাতিরে, বড় হওয়ার তাগীদে শত কষ্ট সইতে হয়। শিহাব স্মরণ করে ইবনে আবী হাতেমের কথা। তিনি বলেন, 'ইল্মের পথে আমরা মিসরে সাত মাস অবস্থান করি। এর মধ্যে একটা দিনও রান্না করা তরকারি খাইনি। দিনের বেলায় উস্তাযদের নিকট কাটাতাম। আর রাতের বেলায় ইল্ম নোট করতাম ও সংশোধন করতাম। একদিন আমার সহপাঠী সহ এক উস্তাযের নিকট এলাম। শুনলাম তিনি অসুস্থ। ফেরার পথে একটা মাছ দেখে আমাদের পছন্দ হল। (ভাবলাম, বাসায় ফিরে পাকিয়ে খাব।) কিন্তু যখন বাসায় ফিরলাম, তখন অন্য এক উস্তাযের নিকট উপস্থিত হওয়ার সময় হয়ে গেল। মাছ থাকল পড়ে,

পাকানো আর হল না। পরিশেষে যখন পচে যাওয়ার কাছাকাছি হল, তখন তা কাঁচাই ভক্ষণ করলাম! আর সত্য কথা যে, শরীরকে আরাম দিয়ে ইল্‌ম লাভ হয় না।'

ইবনুল জওযী বলেন, 'আমি ছোটবেলায় কিছু রুটি সঙ্গে নিয়ে ইল্‌ম তলবের জন্য বের হয়ে যেতাম। পরে রুটি শুকিয়ে যেত। শেষে এক লোকমা রুটি খেতাম ও তার সঙ্গে পানি পান করতাম। ইল্‌ম তলবের যে উদ্যম ছিল কেবল তারই ফলশ্রুতিতে এত কষ্ট বরণ করতে আমি মিষ্ট স্বাদ পেয়েছি।'

'গৌরবলাভের পথে কষ্ট বড় মিষ্ট।' সুতরাং যদি ভাতে কাঁকর-বালি অথবা পোকা থাকে, তরকারি খাবার অযোগ্য হয়, তাহলে শিহাব কেন তা ভাল মনে বরণ ক'রে নেবে না?

অনেক সময় সাদকায় হাঁস-মুরগী আসে। শত শত ছাত্রের জন্য তা মোটেই যথেষ্ট নয়। সুতরাং অনেকের মতে তা উস্তাদদের স্পেশাল হয়ে যায়। এ আচরণ অনেক ছাত্রের নিকট 'অন্যায় ভক্ষণ' বলে মনে হয়। তারা প্রতিবাদ করে এবং ছাত্রদের হক ছাত্রদের জন্য ব্যয় করার দাবী জানায়। তাতে উস্তাযগণ ক্ষুণ্ন হন, অথচ প্রতিবাদকারী ছাত্রদের পাতে একটি ডানাও যায় না। তাই শিহাব সেই ছাত্রদের সমর্থন করে, যারা শিক্ষাগুরুদের সম্মান বজায় রেখে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়।

আসলে ছাত্র-জীবনে কী খেতে পেলাম আর কী খাব---এই ধান্দায় থাকতে হলে পড়াশোনায় একাগ্রতা সৃষ্টি হয় না। সুতরাং বেশিরভাগ সময় কী শিখলাম আর কী শিখতে হবে---এই ধান্দায় থাকলে ফললাভ হয়।

(১৩)

জামেআর ছাত্র-জীবনে তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের সফল পড়াশোনার আর একটি বড় বাধা হল তাদের যৌন-জীবন। সাবালক হওয়ার পর থেকে বিপরীত জাতির একটি মনোমতো সঙ্গীর সন্ধান থাকে সবার মনে। কেউ তা প্রকাশ করে, কেউ তা করে না। কেউ জিতেন্দ্রিয় হয়, কেউ হয় উচ্ছৃঙ্খল।

মানুষের মদোন্মত্ত যৌবন এসে মানুষকে নিপীড়িত করে। পরিবেশের যৌনতাভরা লেবাস-পোশাক, প্রচারমাধ্যম ইত্যাদি তার মনে তুফান তোলে। যদিও শরীয়তের লাগাম থাকে তার সাথে, ইসলামী নৈতিকতার কিশ্‌তী থাকে তার সহায়। কিন্তু সংযমের বাঁধ যখন পরিস্থিতির চাপে ভেঙ্গে যায়, তখনই হয় সর্বনাশ।

জ্ঞানী ছাত্রেরা যৌনতার বন্যায় ভেসে যায় না। ধৈর্যের প্রাচীর খাড়া ক'রে নিজেকে নিরাপদ স্থানে পবিত্র রাখে। নোংরা ছাত্রদের সাথে মিশে নিজেকে নোংরামির নর্দমায় পতিত করে না। অবৈধ প্রেম-ভালবাসার জালে ফেঁসে নিজের ছাত্র-জীবন নষ্ট করে না। বরং সে জীবনকে যথাসময়ের জন্য বিলম্বিত করে। বিবাহের পূর্বে সে জীবনের কোন আচরণ অভিজ্ঞতা লাভের খাতিরেও প্রয়োগ করে না। তারা জানে জীবনে অবৈধ ভালবাসাটাই সবচেয়ে বড় ভুল। আর তারাই হয় সফলকাম।

শিহাব তাদেরই একজন। এক ধনীর দুই সুকন্যাকে সে কুরআন পড়ায়। কুরআনের সুললিত কণ্ঠে তারা মুগ্ধ হয়। ভাবে-ভঙ্গিতে উভয় কন্যাই নিবেদিত-প্রাণ। কিন্তু শিহাব বড় হুঁশিয়ার। অর্থের প্রয়োজন না থাকলে সে এমন লেলিহান শিখাবিশিষ্ট আগুন নিয়ে খেলতে আসত

না।

তবুও আগুন তো আগুনই। কতদিন তার তাপ সহ্য করা যাবে? বিশেষ ক'রে সেও তো আগুনের পাশে ঘি। মানুষই তো; ফিরিশ্‌তা তো নয়। বড় বোন সুহাইবার তুলনায় ছোট বোন সুরাইয়ার তেজ বেশি। সুতরাং শিহাব প্রমাদ গনল। একদিন সুহাইবা সাফ জানিয়েই দিল, সে তাকে ভালবেসে ফেলেছে। সে তাকে বিয়ে করতে চায়।

শিহাব তাকে বুঝাল, 'আমি গরীব ঘরের গেঁয়ো ছেলে। আমার গ্রামের বাড়িতে তুমি থাকতে পারবে না।'

---খুব পারব। আমার নানার বাড়ি গ্রামে। আমার কোন অসুবিধা হবে না।

---আর দালান-কোঠা, খাট-পালঙ্ক, বাথরুম ইত্যাদি কোথায় পাবে?

---সে সব না হলেও চলবে। আপনাকে পেলেই আমার সব পাওয়া হবে।

---কী আছে আমার মধ্যে?

---আমার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে।

---পাগল হয়ো না সুহাইবা। তোমার বড় ঘরে শহরে বিয়ে হবে। গ্রামের কাদা-ধুলোতে কেন মরতে যাবে? আকাশের চাঁদ ধূলির ধরণীতে কেন নেমে আসবে?

---মাটির মানুষ, মাটির সাথে মাটির মতো বসবাস করবে। ধূলির ধরণীতে তো মনের মানুষটাকে পাবে। এটাই কি যথেষ্ট নয়?

সুহাইবা কলেজে পড়া মেয়ে। দ্বীনদার ঘরের মেয়ে কুরআনটা ভাল ক'রে পড়া শিখতে ছিল প্রাইভেট ব্যবস্থা। শিহাব আর বুঝাতে পারল না। নাটক-নভেল পড়া মেয়েকে বুঝানো কি তত সহজ?

বিপদ আসন্ন ভেবে পরদিন সুহাইবার আব্বার সাথে সাক্ষাৎ ক'রে টিউশনিতে জবাব দিয়ে দিল। কারণ জিজ্ঞাসা করলেও স্পষ্ট কারণ সে জানাতে পারল না।

শিহাব যেদিকেই যায়, বিপদ সেদিকেই ছুটে যেতে চায়। ভাল হওয়ার এ এক দোষ। আসলে ভাল হওয়া যতটা সহজ, ভাল হয়ে টিকে থাকা ততটা সহজ নয়।

আবার সে মাদানী সাহেবের সাথে পরামর্শ ক'রে এক মসজিদে ইমামতি করার সুযোগ পেল। কিন্তু মসজিদেও আসে আগুনের ফিনকি। বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত সেই ফিনকি পিছু ছাড়ে না একজন ভাল যুবকের। সেখানেও ছেলে-মেয়ে পড়াতে হবে বাদ আসর। তবে সম্ভবতঃ সেখানে নির্জনতার সুযোগ ঘটবে না। দেখা যাক ময়দানে নেমেই। শুরু হল নতুন কাজ। মক্তবের অভিজ্ঞতা নিয়ে সে ডাইরিতে লিখল,

পাঁচটি পোষা পাখি আমার
পাঁচটিই উদ্‌ভ্রান্ত,
পঞ্চজনের পঞ্চ গতি
পাঁচ শ্রেণীর অশান্ত।
কেউ বা শুধু বকম বকম
খাইতে চাহে নিত্যি,
মাঠের পাকা ফসল ক্ষেতে
পুরতে চায় প্রবৃত্তি।
কেউ তো নাহি থাকতে চাহে
বদ্ধ খাঁচায় আর,

উড়তে চাহে আকাশ পথে
উঁকি দেয় বারবার।
দেহ যদি কারো আবার
থাকে পিঞ্জারাতে,
মনটি তাহার থাকে সদা
বন ও সাহারাতে।
কেউ তো হাসে কিচিরমিচির
হাসতেই শুধু জানে,
মানে নাকো কোনই কথা
বলতে ছোবল হানে।

শুরু হল শিহাবের ইমামতি। শুরু হল তার জুমআর খুতবায় সুন্দর বাংলার বক্তৃতা। বাতি যেখানেই যায়, আলো দেয়। ফুল যেখানেই ফোটে, সুগন্ধ ছোটে। যে ফুল ফিতনার ভয়ে নিজেকে বাগানে গোপন করতে চেয়েছিল, সে ফুলের সুবাস আরও দ্রুত গতিতে ছড়াতে লাগল। জামেআর জালসায় তার বক্তৃতায় মুগ্ধ হল অনেক দূর-দূরান্তের মানুষ।

গ্রামের এক জালসায় বক্তৃতা ক'রে খোশ হল গ্রাম ও এলাকার মানুষ। বুক ফুলে উঠল শিহাবের মায়ের। এবার বুঝি তার স্বপ্ন সফল হবে। কিন্তু দুশমনেরা শুনে বলতে লাগল, 'সার-গাদায় পদ্মফুল। পাপড়িতে গোবরের গন্ধ আছে।'

ওদিকে সুহাইবা মনে মনে কষ্ট পাচ্ছিল। ভালবাসার যন্ত্রণায় কাতর হয়ে তার মন গাইছিল,

কেউ নয় তবু ডাকে

ইশারা নয় মন-ফাঁকে
আকাশ মাঝে পূর্ণিমা তার আমার মাঝে টান,
আমার হৃদয় সিন্ধুতে আজি আসিয়াছে বান।
বন্ধু গো দেখ চাহি
ঐ যায় গাহি গাহি
চেয়ে দেখি থাকি থাকি
মুদি না কভু আঁখি।
ঐ যায় ঐ বহু দূরে আহারে কি মধুর গান।।
যাই না আমি কিন্তু হায়
আমার মন সাহারায়
ফিরবে না ফিরিয়ে দিবেও না
কোলে তুলে নিবেও না
ভুলে যাই সেই গান, সেই সুন্দর সুর-তান।।

প্রায় এক মাস পর হঠাৎ শিহাব দেখল, তার মসজিদে সুরাইয়া এসেছে পড়তে। তাদের বাড়ি এ মহল্লায় নয়। কিন্তু মনের মতো শিক্ষকের খবর শুনে দূর থেকে পায়ে হেঁটে কষ্ট ক'রে চলে এসেছে এখানে। তার বয়স ততটা নয়, দেহও ততটা ঝাড়ালো নয়। পথে ইভটিজিং-এর ভয় নেই। তাই বাজারে বাজারে হেঁটে আসতে কোন অসুবিধাও নেই। সে সামনে পড়া নিতে বসতেই বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ল শিহাব। অবাক হয়ে বলল, 'সুরাইয়া তুমি? অত দূর থেকে এসেছ?'

---কী করব? আপনি আসতে বাধ্য করলেন। সঙ্গে আরো একজন এসেছে। বুবু ভাল নেই জী।

শিহাব সে কথায় কর্ণপাত না ক'রে 'পড়া নাও' বলে পড়তে শুরু করল। মনে মনে ভাবতে লাগল, 'ভূতের ভয়ে চড়লাম গাছে, ভূত বলে আমি পেলাম কাছে।'

আমি গাহিতে চাহি না তবু কেন
দেখিতে চাহি না তবু যেন
গাহিতে চাহিতে কে বলে আমারে?
স্বপ্নালোকে মধুর বেশে
কাছে আসে হেসে হেসে
আমি দেখিব না ভাবি যাহারে।

হ্যাঁ, পরদিনই খামে মোড়া চিঠি পাশে রেখে দিল সুরাইয়া। পড়াবার কর্তব্য শেষ ক'রে বেড়াতে যাওয়ার আগে খামটি খুলে সে পড়ে দেখল। তাতে সেই একই কথা লেখা। '....আমি আপনাকে ভীরু-কাপুরুষ বলব না। কারণ আপনি একজন পরহেযগার আলেম। কিন্তু এতটুকু মায়া-মমতাও কি আপনার মাঝে নেই যে, আমার ব্যাপারে আপনি খবর নিতেও চাননি। আমি যে আপনার জন্য মরি, তা আপনি জানেন বা না জানেন। চাঁদের আকর্ষণে সমুদ্রে জোয়ার আসে, চাঁদ সে খবর নাই-বা জানল। চাঁদনি-রাতের-হেনা ফুটে সৌরভ বিতরণ করে, তাতে চাঁদের খোঁজ রেখে কী লাভ আছে?.......'

শিহাব মনে মনে ধনীর ধনি-কন্যার প্রেমপত্র পেয়ে গর্বিত হল ঠিকই, কিন্তু কোন সায়-উত্তর করল না। হাদীস তাকে বলছে, "একই গর্তে মু'মিন দ্বিতীয়বার দষ্ট হয় না।" কানার লাঠি একবারই হারায়। কিন্তু তাতেও যে সে বদনাম থেকে বাঁচতে পারবে, তার নিশ্চয়তা কোথায়? মানুষের মন যে বড় মন্দ-প্রবণ, শয়তান তার প্রকাশ্য শত্রু।

চিঠির জবাবে সে নিজ নোটবুকে লিখে রাখল,

আমারে ধরিবে কিছু কি কহিবে পিছনে দিয়া ছুট?
পারিবে না তাহা ভাবিয়াছ যাহা কহি নাই আমি ঝুট।
আমায় বাঁধিবে? কি দিয়া বল? পাটের পাকাইয়া রশি?
কক্ষনো না, বাঁধা রহিব না তুমি যতই বাঁধো কষি।
শণ হইতে দড়ি পাকাইয়া বিশগুণ তারে ক'রে
গায়ের জোরে তুমি আমারে বাঁধো হে সেই ডোরে।
তবুও না আমি বড় দুর্দম, তাহাতে আমার দোষ কি?
তোমার এ ডোর চোখের নিমেষে অনাসে দিব ফস্কি'।
তবে কি দিয়া বল বাঁধিবে আমায় মায়া কান্না কাঁদিয়া,
শ্রেষ্ঠ রজ্জু হৃদয় বাঁধনে, পারিবে রাখিয়া বাঁধিয়া?
দিব ফাড়িয়া যাইব ছিঁড়িয়া যদিও হয় প্রেমডোর,
আমি নির্মম, নির্দয় ঘোর, আমি দাগাবাজ চোর!

আর নামাযে-নামাযে দুআ ক'রে বলতে লাগল, 'আল্লাহ! তুমি ফিতনার জাল থেকে রক্ষা কর।'

(১৪)

শিহাবের বিবাহ-চিন্তা মনে আসেনি। যেহেতু তার মনে-প্রাণে ছিল কেবল মদীনার চিন্তা। সোনার মদীনার ভালবাসা তার হৃদয় থেকে অন্য সকলের ভালবাসা মুছে ফেলেছিল। সেই আশা ও চেষ্টা নিয়ে সে পড়াশোনা করছিল। নির্জনে গুনগুন ক'রে গান গাইছিল,

'ম্যাঁয় য়্যাহাঁ হুঁ মেরে দিল মদীনে মেঁ হ্যায়,

মদীনা কী মহব্বত মেরে সীনে মেঁ হ্যায়।'

আকাশে বিমান উড়ে যেতে দেখলে অথবা রাতের আকাশে চাঁদ দেখলে ঐ একই সুর শুনতে পাওয়া যায় তার কণ্ঠ থেকে।

যদিও সুহাইবার অপ্রত্যাশিত মহব্বত তার মনে চমক ধরিয়েছিল। কিন্তু নৈতিকতার খাতিরে তাতে জৌলুস ছিল না, আকর্ষণ ছিল না।

তাদের বাড়ি থেকে আজও তরকারি আসে, মিষ্টি আসে। মাঝে মাঝে সুহাইবার চিঠি আসে, কিন্তু শিহাব কোন জবাব দেয় না।

এখন প্রত্যেক জুমআয় নামায পড়তে আসে তার আব্বাও। শিহাবের বক্তৃতা তাকে ভাল লাগে তাই।

জামেআর বালিকা-বিভাগে শিহাবের এলাকার কিছু মেয়ে পড়াশোনা করে। তাদের সাথে বেশ ভাব সুরাইয়ার। যদিও সুরাইয়া স্কুলে পড়ে, তবুও সে সময় সময় জামেআর ছাত্রী-আবাসে গিয়ে তাদের সাথে আড্ডা জমায়। কেউ কেউ তাদের বাড়িতে আসা-যাওয়াও করে।

ছুটির সময় হলে তাদের অভিভাবকরা আসে। সঙ্গে ক'রে বাড়ি নিয়ে যায়। এক ছুটির সময় পরিকল্পনা ক'রে সুরাইয়া আযীযার বাড়ি বেড়াতে যাবে। আযীযার বাড়ি শিহাবদের পাশের গ্রামে। উদ্দেশ্য আযীযার বাড়ি নয়, উদ্দেশ্য শিহাবদের বাড়ি।

যাওয়ার পথে একই ট্রেনে একই কামরায়! সুরাইয়াকে দেখে শিহাবের চক্ষু চড়ক গাছ। 'সুরাইয়া! তুমি কোথায় যাবে?'

---অবাক হলেন বুঝি? আযীযাদের বাড়ি যাব। সেখান থেকে আযীযার জীজাজীর বাড়ি। আর যদি বলেন, তাহলে আপনাদের বাড়িও দেখে আসব।

অপ্রস্তুত হয়ে শিহাব বলল, 'অবশ্যই অবশ্যই। আযীযা ওকে

আমাদের বাড়ি বেড়াতে নিয়ে এসো।'

শিহাব মাকে খবরটা দিয়ে রাখল, 'মা! আমার এক ছাত্রী বেড়াতে আসতে পারে। আমি বাড়িতে না থাকলে তুমি তার মেজবানি করো। ঐ যে পাশের গ্রামের সেই আযীযার সাথে আসবে।'

মাটির বাড়ি যেমনই হোক। বেশ গোছ-গাছ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক'রে রাখল। হাট-বাজার ক'রে রাখল শিহাব আগে থেকেই। যাদের নুন খেয়েছে, অন্ততঃপক্ষে কিছু গুণ যদি তাদের গাওয়া যায়।

পরের দিনই সুরাইয়া আযীযাকে সঙ্গে নিয়ে শিহাবদের বাড়ি চলে এল। নাই-বা হল বিলাস-বহুল বাড়ি। যে বাড়িতে মনের মানুষ থাকে, সে বাড়ি অতি সুন্দর বাড়ি। যে বাড়িতে মায়ের মতো মা থাকে, সে বাড়ি বেহেশ্‌তী বাড়ি।

চপল কিশোরী সুরাইয়া সন্ধ্যা হওয়ার আগে আযীযাকে জানিয়ে দিল, সে এখানে দু'দিন বেড়াবে। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত যে বড় সমস্যায় ফেলবে শিহাব ও আযীযাকে, সে কথা সে খেয়ালই করল না। বড় আব্দার রেখে বলল, 'আমি মায়ের কাছে দু'দিন বেড়াব।'

মাও কোন সমস্যার কথা না ভেবেই সায় দিয়ে দিল। আযীযার ভাই এসেছিল সন্ধ্যায় তাদেরকে নিতে। সে তার সাথে বাড়ি ফিরে গেল। তাদের মনে সন্দেহের বীজ রোপিত হল, আর হওয়ার কথাও বটে।

কিন্তু সুরাইয়ার তাতে পরোয়া নেই। সে বড় লোকের শহুরে মেয়ে। সে কারো কথার পরোয়া করে না। তাছাড়া সে জানে না যে, গেঁয়ো মেয়েদের কথার বাঁধুনি ও বিঁধুনি কত। জানে না যে, গাঁয়ের এক পাড়ার এক ঘরের এক কোণে কথার ডিম পাড়া হলে ছা হয় তার সব পাড়ার ঘরে ঘরে।

কিন্তু তার জন্য কে বলবে যে, সে শহুরে মেয়ে? সেও যেন এই গাঁয়েরই মেয়ে। এই ধুলো-মাটি, চাটাই-কাঁথা, ধুঁয়ো-ছাই, কুলো-ডালার সাথে পরিচিত মোড়ল-বাড়ির বেটি!

ঘুরে-ঘুরে মায়ের সাথে কাজ করে। শাড়ির কাজ করা শিখতে চায়। রান্নায় সহযোগিতা করে। বাড়ি পরিষ্কার করে। এ যেন মায়ের দোসর পেটে ধরা মেয়ে। পেটে-ধরা মেয়েরাও এমনটি করতে অক্ষম।

সুরাইয়ার ব্যবহার ও আচরণে মা বড় মুগ্ধ হয়। ছোট ভাই ও বোনটি তার একান্ত আপন হয়ে যায়। এ যেন সেই মেয়ে, যার কাছে ভালবাসার যাদু-কাঠি আছে। যে নিমেষে সকলকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করতে পারে।

শিহাবের মনে একটা প্রশ্ন ঘুরঘুর করছিল। কোন কাজে মা পাশের বাড়িতে গেলে সে সুযোগ পেয়ে সুরাইয়াকে বলল, 'তুমি এখানে থেকে গেলে কেন?'

চঞ্চল মেয়ের চাঞ্চল্যভরা উত্তর, 'আপনি যাকে ভালোবাসেন, তাকে ভালোবাসার জন্য।'

---সুহাইবা কী তোমাকে এখানে আসতে বলেছে?

---হ্যাঁ, সেই বলেছে ওস্তাদজীর বাড়ি দেখে আসবি।

---তাকে বলো, যাকে দেখে পছন্দ হয়, তার অন্য কিছু দেখার দরকার হয় না।

---কিন্তু দেখার সুযোগ হলে অন্য কিছুও যদি পছন্দসই হয়, তাহলে কি সোনায় সোহাগা হয় না জী?

---তা কেমন দেখলে আমার বাড়ি?

---সুন্দর।

---এই খড়ের চালের বাড়িকে তুমি সুন্দর বলছ?

---যে বাড়িতে এমন একটা মা থাকে, সে বাড়ি অসুন্দর নয় মশায়।

---পাকা মেয়ের পাকা পাকা বুড়ির মতো কথা।

---আপনার কাছেই তো শেখা।

---তুমি বাড়ি চলে যাও, স্কুল কামাই হবে।

---আপনিও চলুন, মসজিদ কামাই হচ্ছে।

পাশ থেকে ছোট ভাই বলে উঠল, 'না সুরাইয়া আপা! আপনি থাকুন। না ভাইয়া! ওকে যেতে বলবেন না। ও আমার সুন্দর আপা।

ভাইকে জড়িয়ে ধরে শিহাব বলল, 'কেউ সুন্দর হলেই কি কাউকে ধরে রাখা যায় রে ভাই? সুন্দরের জন্য সুন্দর জায়গা চাই। গোলাপ-বেলি ফুল কি জঙ্গলে ফুটতে দেখেছিস। সেসব সাজানো বাগানেই ফোটে। তাছাড়া ওর নামের মানেটা কী জানিস? তারকাগুচ্ছ। আকাশে থাকে। আকাশের তারাকে কি পৃথিবীর এই মাটির ঘরে ধরে রাখতে পারবি?'

সুরাইয়া বলল, 'আর ভাইটি! তোমার ভাইয়ের নামটার মানে জানো? উনিই আমাদেরকে বলেছিলেন, উল্কা! সেও কিন্তু আসমানেরই বাসিন্দা।'

ইতিমধ্যে মা এসে বলল, 'আমার কত বড় সৌভাগ্য যে, আসমানের উল্কা-তারা আজ আমার মাটির ঘরে।'

মায়ের উদ্দেশ্যে সুরাইয়া বলল, 'জানেন মা! ওস্তাদজী মদীনায় চান্স্ পাবেন। হ্যাঁ, উনি ক্লাশের ফার্স্ট-বয়। ঐ জামেআর শেষ বছরে যারা ফার্স্ট-সেকেন্ড-থার্ড হয়, তারাই মদীনা-ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সুযোগ পায়।'

শিহাব প্রতিবাদ ক'রে বলল, 'ভুল বললে তুমি! ঐ ক্লাশে জামেআ-কর্তৃপক্ষের কোন আত্মীয় না থাকলে তবেই চান্স্ পাকা হয়।'

মা বলল, 'আল্লাহর উপর ভরসা রাখ বাবা! তকদীরে থাকলে অবশ্যই চান্স্ পাবি।'

---তকদীরকে ওরা জালিয়াতি ও সুপারিশ দিয়ে পরিবর্তন ক'রে দেয় মা!

---তা কীভাবে?

---ভাইপো-ভাগিনা হলে তাদের নম্বর কম থাকলেও বেশি ক'রে দেওয়া হয়। ফলে আসল হকদারকে ছাঁটাই ক'রে নাহকদারকে হকদার বানায়। আর বলে, 'অউলুল আরহামি বা'যুহুম আউলা বিবা'যিন ফী কিতাবিল্লাহ।' অর্থাৎ, আল্লাহর বিধানে নিকটাত্মীয়গণ একে অন্যের (অন্য অপেক্ষা) অধিক হকদার।

---কেউ কারো তকদীর খন্ডাতে পারে না বাবা!

---পারে মা, পারে। মানুষও তকদীর বানাতে পারে। জীবন-মরণ আল্লাহর হাতে, কিন্তু মানুষও খুন করতে পারে। আর সেটাও হয় তকদীর।

---তবুও আল্লাহ যদি চান, তাহলে অসম্ভবও সম্ভব হয়।

---অবশ্যই। যেমন তোমার সার-গাদাতে পদ্মফুল ফুটতে চলেছে।

(১৫)

বাড়ি ফিরে এসে সুরাইয়া বুবুকে সব কথা খুলে বলেছে। বুবুর সাদা গোলাপে খোশবুর সাথে রঙ লেগেছে। কিন্তু কোন আশার আলো দেখেনি তার বিবরণে। মন দেওয়া হয়ে যায় সহজে, কিন্তু দেওয়া মনকে

ফিরিয়ে আনা সহজ নয়। অবশ্য মন ভাঙ্গা বড় সহজ। তবে ভাঙ্গার কারণ মোটেই নেই।

একতরফা ভালোবাসায় বুক বেঁধে সে কতদিন বসে থাকবে? সুহাইবা ভাবে, সে ভালো না বাসলেও তারই অফুরন্ত ভালোবাসা তাকে ভাগ ক'রে দেবে। তাই যথেষ্ট হবে। সে তো নিরাশ করেনি। সে গরীব বলে নিজেকে ছোট ভাবছে। কিন্তু অন্য বহু দিকে সে যে বড় ধনী, তা কি সে জানে না? আল্লাহ চাইলে সেও বড় অর্থশালী হয়ে যেতে পারে। তাহলে কেন সে উপেক্ষার তীর হেনে তার বক্ষকে ক্ষত-বিক্ষত করছে?

হয়তো ভাবছে, শহুরে মেয়ে পাড়া-গাঁয়ে গিয়ে থাকতে পারবে না। শহুরে ও ধনী বলে তার ভিতরে অহংকার থাকবে। কোনদিন সেই অহংকারে সে অথবা তার মা আঘাত পাবে। তাছাড়া সে তো কলেজ-পড়ুয়া ছাত্রী। অধিকাংশ কলেজ-পড়ুয়ারা ভাল থাকে না। সে হয়তো জামেআ-পড়ুয়া ছাত্রী চাইবে; যদিও জামেআ-পড়ুয়াদের মধ্যেও অনেকের হাত মেঁ কুরআন, আর বগল মেঁ গু। তাদের মন বলে,

'এক হাতে মোর কোরান শরীফ
মদের গ্লাস অন্য হাতে,
পুণ্য-পাপের সৎ-অসতের
দোস্তি সমান আমার সাথে।'

কিন্তু শিহাবের মা সুরাইয়াকে দারুণভাবে পছন্দ করেছে। সে হয়তো তাকেই বউ করতে চায়। যদিও সে তার বড় বোনের খবর জানেই না।

জামেআ খুলে গেল। শিহাব মসজিদের চাকরির কারণে আগেই চলে এসেছিল। সুরাইয়া রীতিমতো তার কাছে পড়তে যায়। আর সেই সাথে বুবুর ব্যথা-বেদনা পৌছানোর কাজটাও নিয়মিত ক'রে যায়।

শিহাবের একই কথা। সে বলে, বিয়ে করলেও বিয়ের আগে কনের সাথে যোগাযোগ রাখা শরীয়তে বৈধ নয়। তাছাড়া তাতে তার পড়াশোনায় ক্ষতি হবে। যদিও বহু মেয়ের বাবা মেয়েকে সেই সুযোগ দিয়ে কন্যাদায় থেকে মুক্তিলাভের স্বপ্ন দেখে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বদনামের থুথু ছাড়া নেকনামের ফুল বর্ষে না।

শিহাব তার গুবরে পদ্মফুলকে আর কর্দমাক্ত করতে চায় না। প্রেমের ময়দানে বীর পুরুষ হওয়া কোন সুনাম নয়, কাপুরুষ হওয়াটাই সুনাম। সুতরাং সেই সুনাম রক্ষা করতে তাকে জিহাদ চালিয়ে যেতেই হবে।

শিক্ষাঙ্গনে প্রেম-প্রীতির রীতি বর্ধমান দেখে শিহাব দুঃখিত হয়। যেখানে শরয়ী পর্দার সঠিক ব্যবহার নেই, যেখানে তরুণ-তরুণীর অবাধ মেলামেশা থাকে, সেখানে প্রেম যে স্বাভাবিক, তা শিক্ষাঙ্গনের বাইরেও পরিদৃষ্ট হয়। আকারে-ইঙ্গিতে সে পড়ানোর শেষে ছাত্রীদেরকে দেওয়া উপদেশে সে কথা প্রায় বলে থাকে। যে নেশার সে নিজেই শিকার, সেই নেশায় যেন অন্য কেউ চুর না হয়, সে কথাই বারবার বুঝায়। কিন্তু মনে হয়, তার উপদেশে কাজ হওয়ার মতো আশা সুদূর পরাহত।

অনেক জামেআ-পড়ুয়া ছাত্রীও মানতে চায় না। কারো বাপ আলেম হলে সে বাবাপন্থীই থেকে যায়। যদি বলা হয়, 'পর্দায় চেহারা ঢাকা ওয়াজেব।'

সে বলে, 'আমার আব্বা বলে, চেহারা দেখানো জায়েয। আমি আমার আব্বার হাদীস মানি।'

যদি বলা হয়, 'ফরয নামাযের পর দুআ বিদআত।'

সে বলে, 'আমার আব্বা তো করে। সেও তো আলেম। আমি আমার

আব্বার ফতোয়া মানি। তাই আমিও দুআ করি। দুআ কি খারাপ জিনিস?!'

এভাবেই জামেআর ছাত্রী হলে কী হবে? 'কুল্লু ফাতাতিন বিআবীহা মু'জাবাহ।' সব মেয়েরেই আব্বা নিজ নিজ কাছে সবার চেয়ে বড়। নিজের ঘোলকে টক বলা বড় কঠিন, বড় পরাজয় যে।

আর এমন 'আব্বাপন্থী' মেয়ের যদি কোন বড় আলেমের সাথেও বিয়ে হয়, তাহলে স্বামীকে 'বড়' বলে মেনে নিতে চায় না। আর যদি ভাগ্যচক্রে নিজে 'বড় আলেম' হয়েই যায় এবং আলেম স্বামীর দুর্বলতার কথা বুঝতে পারে, তাহলে তো অহংকারই হয় তার শ্রেষ্ঠ অলংকার। আর তাদের সংসার হয় সাক্ষাৎ সাক্বার (জাহান্নাম)।

শিহাব কলেজ বা জামেআ-পড়ুয়া নয়, সে একজন আদর্শ স্ত্রী পাওয়ার স্বপ্ন দেখে। পড়লে শিক্ষিত হওয়া যায়, কিন্তু আদর্শ হওয়াটা আলাদা জিনিস। সেই আদর্শ যে কে, তা সে কীভাবে জানবে? কাউকে সাময়িকভাবে কিছু আদর্শের কাজে দেখা গেলে, সে আদর্শবাদী হবে---তাও জরুরী নয়। আদর্শবাদী জীবন-সঙ্গিনী পাওয়া---সে তো বড় ভাগ্যের ব্যাপার। মহান আল্লাহ বান্দাকে দুনিয়ার সুখ ভোগ করার জন্য যা কিছু নেয়ামত দান করেন, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় নেয়ামত হল আদর্শ স্ত্রী। কিন্তু সেই নেয়ামত কি শিহাবের ভাগ্যে জুটবে?

সে জিনিস দেখে, পছন্দ করে, বেছে নেওয়ার কোন উপায় নেই। যেহেতু রূপ দেখা যায়, কিন্তু গুণ দেখতে দীর্ঘ পরীক্ষার প্রয়োজন পড়ে। তাই প্রত্যেক নামাযের শেষাংশে সে 'রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুন্য়া হাসানাতাঁউ অফিল আ-খিরাতি হাসানাহ....' বলে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে।

(১৬)

সুরাইয়া শিহাবের বাড়িতে মায়ের কাছে যে বালিশে শুয়েছিল, তার কভারটি মায়ের করা। শিহাবের হাতে আঁকা এবং মায়ের হাতে তোলা ফুল যেন বেহেশ্‌তী সওগাত। মা তাকে শিহাবের আঁকা ফুলের খাতা ও কবিতার নোট-বুকও দেখিয়েছিল।

সেসব কথা শুনে সুহাইবার ভালোবাসার গোলাপ আরো লালে লাল হয়ে উঠেছিল। শহুরে মেয়েদের মধ্যে কাপড়ে ফুল-তোলার কলা নেই। তবে গেঁয়ো মেয়েদের সেই কলা দেখার শখ অনেকেরই আছে। সুহাইবাও তাদেরই একজন। কিন্তু সুরাইয়ার বিবরণ শুনে তারও ফুল তোলার শখ মনে জাগল। সুতরাং একটুকরা সাদা কাপড় দিয়ে সুরাইয়াকে বলল, 'ওস্তাদজীকে বলিস, বালিশের কভার করব। যেন সুন্দর ক'রে একটি ফুল এঁকে দেয়।'

শিহাব বলল, 'আমি যে ফুল আঁকতে জানি, তা কে বলল?'

---আপনার মা। আপনার আঁকা ফুলে আমি শুয়ে এসেছি।

---ও বাব্বা! তুমি কম বড় সি.আই.ডি নও তাহলে। কিন্তু আর কাউকে বলো না, নচেৎ লাইন পড়ে যাবে।

---ভালো তো, টাকা নেবেন, আঁকার পারিশ্রমিক নেবেন।

---আমার আঁকারও দরকার নেই, টাকারও দরকার নেই। তাতে কত সময় যাবে জানো?

সুহাইবা থেকে শিহাব যত দূর হতে চায়, সুহাইবা যেন তাকে তত কাছে ক'রে নেয়। যদিও সে তার সামনে যায় না। কলেজের পথে ভুলেও আসে না। তাদের বাড়িও যায় না। কিন্তু যোগাযোগের মাধ্যম

সুরাইয়াকে সে কোনমতেই বাধা দিতে পারছে না।

একবার ক'রে সে ভাবে, মসজিদের চাকরিটাও সে ছেড়ে দেবে। কিন্তু তাহলে তার চলবে কী ক'রে। দুঃখিনী মায়ের কষ্ট লাঘব হবে কীভাবে। উভয় সংকটে পড়ে স্বাভাবিক থাকল শিহাব। সাদা-সিধাভাবে একটা ফুল এঁকে দিল সেই সাদা কাপড়ে, সেই প্রেম-ভিখারিনীর সাদা হৃদয়-পর্দাতে।

এ রকমটাই হয়। যাকে ভালবাসি, তার পরশের কোন জিনিস পেয়ে তা স্পর্শ করলেই মন তার ভালবাসার ছোঁয়া পায়। কোন স্মৃতিচিহ্ন পেলে বারবার তাকে স্পর্শ করতে ইচ্ছা হয়। প্রেম-পাগল মনের পেয়ালা আনন্দে উচ্ছলিত হয়। মনের কল্পনা বড় আজীব, মনের চাহিদা বড় অদ্ভূত, মনের প্রবণতা বড় অবান্তর!

সুহাইবা কাপড়ে ফুল তুলতে জানে না। মা পাড়া-গাঁয়ের মেয়ে, সে জানে। সেই গোটা ফুলটা তুলে দিল। তার এক কোণে চিকচিকে সুতো দিয়ে তুলে দিল মেয়ের নাম 'সুহাইবা'।

তারপর দর্জির কাছে কভার বানিয়ে পাঠিয়ে দিল শিহাবের কাছে। শিহাব জিজ্ঞাসাও করল না, ফুলটা কে তুলেছে? তবে তুলেছে চমৎকার! সে হয়তো মনে মনে ধারণাই করেছে, যার নাম, নিশ্চয় সেই তুলেছে।

তবে জামেআর হোস্টেলে সে তা ব্যবহার করেনি। কারণ কেউ দেখলেই বিপদ। আবার সেই সাদা কাপড়ে দাগ লাগার ভয়।

সাপ্তাহিক কোন ছুটিতে বাড়ি গেলে তা মায়ের হাতে দিয়ে বলল, 'এই দেখো, সুরাইয়াকে তুমি আমার আঁকা বালিশ-কভার দেখিয়েছ, তারপর আমাকে দিয়ে আঁকিয়ে এই কভার বানিয়ে দিয়ে পাঠিয়েছে।'

---খুব সুন্দর হয়েছে বাবা! মেয়েটাও বড় মিষ্টি। কিন্তু নামটা তো ওর মনে হচ্ছে না।

---হ্যাঁ, ওরই বড় বোনের নাম দিয়েছে। আমি ওদের জীবন থেকে যত দূর হতে চাচ্ছি, ওরা আমাকে তত কাছে টানতে চাচ্ছে।

---ভাল লোক বলেই তো বাবা! তা না হলে গরীব জেনেও কি কাছে টানে? বড়লোক আত্মীয়রা দূরে সরে যাচ্ছে। এখন কোন স্বার্থে কোন অনাত্মীয় যদি কাছে টানে, তাহলে তার কাছে হতে দোষ কী?

---জানো? দুর্নাম হবে। আবার লোকে বলবে, 'গোবুরে পদ্মফুল।'

---সাবধান থাকবি। এমন পথে চলবি না, এমন কাজ করবি না, যাতে সাদা কাপড়ে কাদা লাগে।

---লোকে কাদা ছিটিয়ে দেবে মা! আমাদের অথবা ওদের দুশমনরা লক্ষ্য করলে রেহাই দেবে না।

---যাস্ না ওদের বাড়ি।

---কিন্তু সুরাইয়া যে আমার কাছে পড়তে আসে। তাকে মানা করেও পারি না। অবুঝ মেয়ে কখন আমার উপর বিপদ টেনে আনবে, তা ঠিক নেই। এ বছরটাই শেষ বছর ছিল। কোন রকম কেটে গেলে বাঁচতাম।

---আল্লাহর কাছে দুআ কর, যাতে সব ফিতনা থেকে রক্ষা করে।

(১৭)

শেষ বছরের শেষ পরীক্ষায় প্রাণপণ লড়াই। এ লড়াইয়ে জিততেই হবে। এ লড়াইয়ে জিতলে তবেই যাওয়া যাবে সোনার মদীনা। শিহাব দস্তুরমতো প্রস্তুতি নিয়ে যথানিয়মে ফার্স্ট হল। সৌভাগ্যক্রমে তাদের ব্যাচে মাত্র একজনই জামেআ-কর্তৃপক্ষের আত্মীয় ছিল।

আশা যেমন পাকা হল, তেমনি সে তাহাজ্জুদের নামাযেও আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করতে লাগল। মায়ের আশা ও দুআ তো আছেই। আশা ও দুআ আছে সুহাইবা-সুরাইয়া ও তাদের আব্বা-আম্মার।

প্রিন্সিপালের নিকট থেকে আশা পেলে পাসপোর্ট বানাবার ব্যবস্থা নিল। দিল্লী গেল সার্টিফিকেট এ্যাটেস্টেশন করতে। ফিরে এসে কাগজপত্র মদীনায় পাঠানোর ব্যবস্থা হল। ইতিপূর্বে আরবী কথোপকথনের ট্রেনিং হয়েছে। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসা বিশেষ প্রতিনিধি-দলের তত্ত্বাবধানে বিশেষ ট্রেনিং হয়েছে। সব কিছুতেই ঠিকঠাক আছে। কেবল মঞ্জুরি আসার অপেক্ষা।

ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে জামাআতের লোক মসজিদেই থাকতে বলল। শিহাবও রাজি হয়ে গেল। বহু জায়গায় ছড়িয়ে গেল শিহাবের মদীনায় চান্স্ পাওয়ার খবর। আসতে লাগল বিবাহের পয়গাম।

জামাআতের অনেক লোকের তো বটেই, খোদ সুহাইবার আব্বাও পয়গাম দিয়ে রাখতে ভুল করেনি। চান্সের খবর শুনে সে মিষ্টি খাওয়াতে ও শিহাবের মায়ের জন্য পাঠাতে ভুলে যায়নি। কিন্তু শিহাব তখনও স্পষ্ট সম্মতি জানায়নি।

জামাআতের মধ্যে এক লোকের মেয়ে সে বছরেই জামেআতে পাশ করেছে। তার ইচ্ছা এবং মেয়েরও ইচ্ছা শিহাবের মতো ছেলেকে জামাই করার। কিন্তু শিহাব বলে, 'তার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে।'

কিন্তু সে লোকের আন্দাজ ছিল, সুহাইবার সাথে তার বিবাহ হবে। তাই একদিন খুলেই বলল, 'আলেম হয়ে আলেমাকে বিয়ে করাই

ঠিক। কলেজে পড়া মেয়ের চরিত্র ঠিক আছে কি না, তাও সন্দেহের ব্যাপার।'

শিহাব উত্তরে বলল, 'আলেমা বিবিরই যে চরিত্র ঠিক আছে, তার গ্যারান্টি কোথায়? চরিত্র ভাল থাকা-না থাকার ব্যাপার তো সব মানুষের ক্ষেত্রেই সন্দেহজনক হতে পারে।'

পয়গাম এসেছে তার প্রথম মাদ্রাসার জায়গিরি বাড়ি থেকে। যতই হোক তারা তো একাধিক বছর তাকে খাইয়েছে। এখন যদি সেই দাপে জামাই হতে রাজি হয়ে যায়। কিন্তু তার একই কথা, 'তার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে।'

চাকরি-ওয়ালা চাচাও সুযোগ হাত-ছাড়া করেনি। যে এতদিন শিহাবের পড়াশোনার ব্যাপারে কোন খোঁজ-খবর নেয়নি এবং কোন সাহায্য-সহযোগিতাও করেনি, সেও নিজের মেয়ে দেওয়ার জন্য শিহাবের মায়ের কাছে আর্জি জানিয়েছে। বাড়ি বানিয়ে দেওয়ার লোভ দেখিয়েছে। সুসময়ের বন্ধু বটে অনেকেই হয়, এখন তাদের সুসময় এসেছে, তাই সুস্বাগতম জানাতে অনেক লোক। কিন্তু তার মায়েরও ঐ একই জবাব, 'ছেলের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে।'

মা রাজি ছিল, সুহাইবার আব্বাও চাচ্ছিল বিয়েটা সেরে ফেলতে। কিন্তু শিহাব বলল, 'মদীনা থেকে ফিরে এলে তবেই সে বিয়ে করবে।'

সুহাইবার তাতে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যেতে চায়। বাড়িতে আসতে বললেও সে আসে না। কোন চিঠির উত্তরও দেয় না। কীভাবে সে অপেক্ষার দিনগুলি গুনে গুনে কাটায়?

সুরাইয়া অনুরোধ করলেও কোন ফল হয় না। সে তাকে বলে, 'মনে কর, বিয়ের পর যদি আমার মদীনা যাওয়া না হয়, তাহলে কি তোমরা

ঠকে যাবে না? আমি কাউকে ঠকাতে চাই না।'

কিন্তু সুহাইবা দগ্ধ হয় ভালবাসার আগুনে। সে যেন বলে,

মথিত যৌবন গ্রথিত বেদন ঘিরে আছে বুক আমার,
নিপীড়িত নিষ্পেষিত আমি ব্যথা শোন ঐ হিয়ার।
মরমর্ শব্দে চুরচুর হয়ে
ভাঙ্গিতেছে বুক তবু আছি সয়ে
যেন থৈথৈ যমুনার উতলা পানি করিতেছে বুক চুরমার।
ঝর্ঝর্ ঝরনার গতি অবিরাম
মরু উদ্যান তবু নয়নাভিরাম
ঐ ঝড় আসে শন্শন্ বেগে ক'রে সব একাকার।
শূন্য পিপাসিত বুকে আঁকা
অগ্নিছবি, তাই করে খাঁ খাঁ
কে বুঝিবে আর সে বিনে এ জ্বলা বুকের হাহাকার।

আশায় আশায় দিন পার হচ্ছিল। ঠিক একদিন মদীনার মঞ্জুরি এসে গেল। খবর শুনে শিহাব ও তার মা শুকরানার নামায পড়ল। সুহাইবা-সুরাইয়া ও তাদের আব্বা-আম্মা আল্লাহর শত শুকরিয়া আদায় করল। যারা শিহাবকে ভালবাসত, তারা সবাই আনন্দিত হল। নিরানন্দে ঝলসে গেল তারা, যারা তার প্রতি শত্রুতা ও হিংসা পোষণ করত।

পাসপোর্টও এসেছিল আগেই। একদিন ভিসা লাগাবার জন্য অন্যান্য সাথীদের সাথে রওনা হল দিল্লী। সেখানে অন্যান্য ছাত্ররা অন্যান্য জামেআ থেকে এসেছিল। ভিসা-সার্চে রিপোর্ট পাওয়া গেল, ভিসা সকলের আছে, কিন্তু কেবল শিহাবের প্লেনের টিকিট আসেনি। কোন গন্ডগোলের কারণে তার টিকিটটি ইস্যু হয়নি।

খবর খারাপ হলেও শিহাব 'আল-হামদু লিল্লাহ' পড়ল। কিন্তু টিকিটের জন্য বড় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হল। কী করবে সে?

এম্বেসির ইনকুয়ারিতে জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে পারল, যদি সে নিজে টিকিট ক্রয় ক'রে মদীনায় যায়, তাহলে সেখানে গিয়ে সে মূল্য পেয়ে যাবে। কিন্তু টিকিটের মূল্য কত? আর সে মূল্য পাবে কোথায়?

দিল্লীতে পরিচিত সে রকম কেউ নেই। যে আছে, তার কাছে অত টাকা নেই। সুতরাং সাথীরা পরামর্শ দিল, বাড়ি ফিরে টাকা যোগাড় ক'রে শীঘ্র ফিরে এসো। ট্রেনের টিকিট কাটল আগামী সকালের।

যারা ভিসা-টিকিট হাতে পেয়েছিল, তারা খুব খুশী হল। আল্লাহ তাদেরকে কোন পরীক্ষায় ফেলেননি। সুতরাং তারা খুশীর মাত্রা পরিপূর্ণ করতে প্যান্ট-শার্ট পরে রাত্রে সিনেমা দেখে এল। এরাই সেই আরবী জানা লোক, যাদের কারণে আলেম-সমাজ বদনামের শিকার।

মহান আল্লাহ তাঁর ভক্তকেই বেশি পরীক্ষায় ফেলেন। শিহাব সেই পরীক্ষায় পাশ করবার আশায় কালকা-মেলে উঠে বসল। তবুও সৌভাগ্যের ব্যাপার যে ভিসা এসেছে, অনেকের তো ভিসাও পৌঁছে না।

বাড়ি ফিরে এবারে তো সে নিরুপায়। কিন্তু হাত পাতলে পাতবে কার কাছে? এমন কেউ আত্মীয় নেই, যে তার মতো নিঃস্বকে দশ হাজার টাকা ঋণ দেবে। কোন্ ভরসায় দেবে? মদীনা গেলেও সেখান থেকে ফিরে এসে সে যে পরিশোধ করতে পারবে, তার কি কোন গ্যারান্টি আছে?

চাচার কাছে হাত পেতে নিজেকে ছোট করতে চাইল না। মামার কাছে ব্যাপারটা জানালে সে ওজর পেশ করল। খালুর কাছেও অত টাকা নেই বলে খালা জানিয়ে দিল। ভাবল, যে সামান্য জমি আছে, তা

বন্ধক দেবে। মা বলল, 'দরকার হলে বাড়ি বন্ধক দেব।' কিন্তু তাতে মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও চলে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

সুহাইবার আব্বার কাছে চাইলে চাওয়া যায়, কিন্তু তারাও তা আগাম 'বরপণ' ভাবতে পারে। লোকে জানতে পারলে, তারাও বলবে, 'গু নয়, বাবা হেগেছে।'

কোনদিন সুহাইবাও হয়তো ঐ ইহসানী স্মরণ করিয়ে খোঁটা দিতে পারে।

কিন্তু গরীবের দুর্দিনে সহায় ছিল সেই। সুতরাং তার কাছে ঋণ চাওয়ায় দোষ নেই। দেরি না ক'রে ছুটল তার কাছে।

এদিকে গ্রামে ও এলাকায় কানাঘুষা শুরু হল, 'কী ব্যাপার? ও যে আরবে চান্স্ পেয়েছিল।'

---বোম্বাই হাজী হয়ে এল আর কী?

---আরব যাওয়া কি মুখের কথা?

---রঙ লাগল, দাম বাড়ল আর কী? লোকে এবারে বলবে তো, 'আরবে চান্স্ পাওয়া মৌলবী।'

হীন মানুষদের হীন উদ্‌গিরণ তার গোবর-গন্ধে সংযোজন সাধন করল। যদিও তারা ক্ষতি করল নিজেদেরই।

প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। ঠিক মাগরিবের আগে শিহাব পৌঁছল সুহাইবাদের বাড়িতে। সবাই অবাক-হতবাক! কী ব্যাপার? সুহাইবার আব্বা কুশলাদি বিনিময়ের পর জিজ্ঞাসা করল, 'কোন সমস্যা হল বাবা?'

---জী, ঐ রকমই বটে। পরে বলছি।

সাথে-সাথে শরবত ও নাশ্তা পেশ করা হল। তাতে সেও অবাক

হল। কী ব্যাপার? এসব আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল কার জন্য?

সুরাইয়াকে সম্বোধন ক'রে শিহাব বলল, 'নাশ্তা রেডি, আমার আসার খবর কি আগে থেকেই জানতে পেরেছিলে?'

---জী না। আপা রোযা রেখেছিল, মানতের রোযা। আপনি সঊদী আরব গেলে তিনটি রোযা রাখবে। আজ তার প্রথম দিন।

বহুদিন পর ওস্তাদজী বাড়িতে এসেছে। ইতিপূর্বে বহু অনুরোধ-আব্দার করা সত্ত্বেও আসেনি। তাই সুহাইবা অপ্রস্তুত ছিল। সে সুরাইয়াকে তার রোযা রাখার কথা বলার জন্য ধমক দিতে লাগল। যে মানুষকে পাওয়ার জন্য তার এত সাধনা, এত ব্রত, সেই মানুষ আজ তার বাড়িতে। মা বলল, 'ওস্তাদজীকে সালাম ক'রে আয় মা!'

সুহাইবা অভিমানভরা কণ্ঠে বলে উঠল, 'না। উনাকে চলে যেতে বল। এক্ষনই বদনাম রটে যাবে। উনার না বদনামের খুব ভয়। তাহলে কেন এসেছেন আবার বদনাম নিতে?'

কথাগুলি বৈঠকখানা থেকেই শুনতে পেল শিহাব। সুরাইয়া সমর্থন ক'রে বলল, 'ঠিকই বলেছে আপা।'

আব্বা বলল, 'না-না। ও এমনি আক্ষেপে বলছে।'

আসলে মনে-প্রাণে বেশি চায় তাকে, তাই বলেছে। কিন্তু জবাবে কী বলবে শিহাব তা খুঁজেই পেল না। এ তো বিয়ের পরে স্ত্রীর মতোই অভিমান।

ইতিমধ্যে আযানের শব্দ কানে এলে নাশ্তা খেতে বলল আব্বা। শিহাব নাশ্তা খায় ও তার মন গায়,

বিষাদ-সিন্ধুর বন্ধু আমার বিন্দু-বারি আঁখে,
সপ্ততলে বন্দিনী সে, হৃদয় নদীর বাঁকে।

ক্ষোভ-লজ্জায় অস্থি-মজ্জায় পীড়িতা দুখিনী বিধুরা,
বিরহে আমার কাতর বড় প্রণয়ে আমার মধুরা।
সীমন্ত তার সীমান্তহারা জীবন্ত যেন মরা,
কী লাগি তার হইল বিদগ্ধ কণ্ঠ মধুক্ষরা?
দেখিয়া সে দৃশ্য কাঁপে যে বিশ্ব নিষ্করুণ ব্যথাতুর,
চঞ্চল হৃদয় বিধুনিত-মন বুঝে তাহা বহুদূর।
আর পারি না বন্ধু দেখিতে আমি চরম উপায়হারা,
ভাবিও না মোরে অন্ধ, আমি অস্তপথের তারা।

নামাযের মধ্যেই শিহাব চিন্তা করছিল, কীভাবে বলবে কথাটা। নামায পড়ে ফেরার পথে সুহাইবার আব্বা নিজেই জিজ্ঞাসা করল, 'কী সমস্যা, তা তো বললে না বাবা!'

---জী! আমাকে বলতেও লজ্জা লাগছে। আর না বলেও উপায় নেই। একজন গরীব ছেলের ইল্মের পথ বড় দুর্গম, বড় বন্ধুর।

---কী হয়েছে খুলে বল।

পকেট থেকে পাসপোর্ট বের ক'রে দেখিয়ে শিহাব বলল, 'এই দেখুন ভিসা লেগে গেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইউনিভার্সিটি থেকে আমার নামে টিকিট আসেনি। টিকিট কিনে যেতে পারলে, সেখানে তার মূল্য ফেরৎ পাওয়া যাবে। আর আমার কাছে তত টাকা-পয়সা ছিল না বলে ফিরে এলাম। এক সপ্তাহের মধ্যেই ফিরে যেতে হবে।'

---কত টাকা লাগবে?

---দশ হাজার টাকার মতো।

বলেই যেন মাটিতে মিশে যেতে লাগল শিহাব। শ্বশুর হওয়ার আগেই শ্বশুরের কাছ থেকে টাকা চাওয়ায় তার মুখমন্ডল লজ্জায় রাঙা

হয়ে উঠল। পরপর বলল, 'ঋণস্বরূপ নেব। মদীনায় গিয়ে আমি আপনার নামে চেক পাঠিয়ে দেব।'

আশ্বাস দিয়ে সুহাইবার আব্বা বলল, 'সে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। আমি ব্যবস্থা করছি।'

সে রাত্রে ফিরে যাওয়ার উপায় ছিল না। খাওয়া-দাওয়ার পর সে তার পূর্বের চাকরিস্থল মসজিদে অথবা জামেআয় গিয়ে রাত্রিযাপন করার ইচ্ছা প্রকাশ করল। কিন্তু আত্মীয়তার বন্ধনে যে জড়িত হতে চলেছে, তাকে কি আর বাইরে রাত্রিবাস করতে দেওয়া যায়?

(১৮)

সবাই যখন শুয়ে পড়েছে, তখন সুরাইয়াকে সাথে ক'রে সুহাইবা শিহাবের কাছে এল। লজ্জায় চাদর মোড়া ছিল তার সারা দেহে। কলেজে পড়া মেয়েও যে এমন হয়, তা শিহাবের জানা ছিল না।

তাদেরকে আসতে দেখে উঠে বসল শিহাব। তখনও জামা খুলে রাখেনি সে, হয়তো বা এই আশঙ্কাতেই। সালাম দিয়ে জড়সড় হয়ে পালঙ্কের শেষ প্রান্তে বসল সুহাইবা। সুরাইয়া বসল সোফাতে।

তারপর চুপচাপ। কে কী বলবে, কী দিয়ে কথা শুরু করবে যেন কেউ জানে না। মুখর মেয়ে সুরাইয়াই বলে উঠল, 'মদীনা শরীফে কবে পৌঁছবেন জী?'

---হয়তো বা এক সপ্তাহের ভিতরে।

এতক্ষণ সুহাইবার চোখ মনের কথা বলছিল। এবারে সে মুখ খুলে বলল, 'এর পর তো আপনার চিঠি দিতে কোন ভয় বা লজ্জা থাকবে না।'

---ইন শাআল্লাহ, থাকবে না।

---সেখানে আমাদের জন্য দুআ করবেন।

---সে কী বলতে হয় সুহাইবা? তোমাকে খুব কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু সেটাই ছিল সঠিক সিদ্ধান্ত। তাতে আমি দুঃখিত। তুমি আমার জন্য দুআ কর, মানত কর---এ আমার জন্য বড় গর্বের বিষয়। আমি নিশ্চয় তোমাকে পেয়ে ধন্য হব। কিন্তু তুমি পাড়াগাঁয়ে থাকতে পারবে তো?

---খুব পারব।

সুরাইয়া বলে উঠল, 'স্বামী-সুখে বনবাস।'

সুহাইবা তাকে ধমক দিয়ে বলল, 'এই! তুই চুপ কর। মেয়েটা বড় কটকটি!'

শিহাব বলল, 'আর একটা বছর ধৈর্য ধরে থাক। নিজেকে হিফাযতে রেখো। ইসলামী বই পড়ো। আগামী বছর ইন শাআল্লাহ তোমার আশা পূর্ণ হবে। মদীনা থেকে এসে বাড়িতে কল-পায়খানা ক'রে তোমাকে নিয়ে যাব।'

আবার নীরবতা নেমে এল মজলিসে। আবারও সুরাইয়া বলল, 'আর কিছু বলবেন না?'

শিহাব বলল, 'তুমি আর ট্যাং-ট্যাং ক'রে বাইরে বেড়ায়ো না। এবার বড় হয়েছ, খেয়াল রেখো। আর পড়াশোনা ভাল ক'রে করো।'

সুরাইয়া বড় আনন্দের সাথে দুষ্ট হাসি হাসি হেসে বলল, 'যথা আজ্ঞা জী! ও আমার জীজাজী!'

---বেশ যাও শুয়ে পড়গে। আমাকে ভোরে উঠে ট্রেন ধরতে হবে।

ফজরের নামায পড়ে চা খেয়ে সকলের নিকট বিদায় নিয়ে শিহাব আল্লাহর নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বাড়িতে এসে মায়ের সঙ্গে দেখা

ক'রে জামাআতে বিদায় নিয়ে দিল্লী চলে গেল।

এক সপ্তাহের ভিতরে শিহাব আকাশে উড়ে স্বপ্নের দেশ সোনার মদীনায় পৌঁছে গেল। এত বছর ধরে যে প্রিয় দেশের জন্য বুকভরা আশা ক'রে অধীর অপেক্ষায় ছিল, সেই দীর্ঘ অপেক্ষার আজ অবসান ঘটল। মহানবীর দেশে এসে সে মহান আল্লাহর শত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল। মসজিদে নববীতে মাগরিবের নামায পড়ে নবীর কবর যিয়ারত করল। আনন্দ-পুলকে তার হৃদয়ে-শরীরে শিহরণ এল। সে আনন্দের কথা একমাত্র অভিজ্ঞ নবীভক্ত ছাড়া অন্য কেউ কি শুনে-পড়ে অনুভব করতে পারে?

রাত্রে হোস্টেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে রুমে ফিরে কৃতজ্ঞতার চিঠি লিখল মাকে, জামেআর কর্তৃপক্ষকে এবং সুহাইবার আব্বাকে। প্রথম চিঠি লিখল তাকে, যে তার অপেক্ষায় দিবারাত্রি প্রহর গুনছে এবং তার জন্য মঙ্গল কামনা করছে।

ইন্টারভিউ দিয়ে হাদীস-কলেজে ভর্তি নিল। সেখানে মাসিক বৃত্তি-সহ আরো অন্যান্য অর্থ-সাহায্য পেতে লাগল।

মাস খানেকের ভিতরে মক্কা মুকার্রামায় গিয়ে ইউনিভার্সিটির বাসে উমরা ক'রে এল।

পরবর্তী ষান্মাসিক ছুটিতে আব্বার নামে উমরা ক'রে এল।

প্রায় ছয় মাস পর সুহাইবার আব্বার নামে চেক পাঠিয়ে দিল।

খরচের জন্য মায়ের নামে চেক পাঠিয়ে দিল।

বাৎসরিক ছুটির আগে হজ্জ পড়লে হজ্জ সেরে নিল।

বাজারে কেনা-কাটা শুরু করল। মায়ের জন্য শাড়ি কিনল এবং দুটি সোনার বালা কিনল; সময়ে কাজে দেবে বলে। ভাই-বোনের জন্য

পোশাক কিনল। বোনের জন্য একটা সোনার চেন কিনল। মোহরের জন্য অলংকার কিনল। বিয়ের শাড়ি আরো কত কী কিনল।

ধীরে ধীরে সময় কাছিয়ে এল দেশে ফেরার, অভাগিনী মায়ের সাথে সাক্ষাৎ করার, অপেক্ষমাণ প্রণয়-প্রার্থিনীর সাথে চির প্রেম-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার।

কত পবিত্র সে মুহূর্তগুলি, কত আনন্দের সে লহমাগুলি, কত সুখের সে প্রহরগুলি!

সেই দিন এল, যেদিন সেই একনিষ্ঠ তালেবে-ইল্‌ম ধনীর ধনি-কন্যা সুহাইবার মতো স্বামীপ্রাণা জীবন-সঙ্গিনী পেল। ইল্‌মের বন্ধুর পথে নির্বিচল হাঁটার পর মদীনার উদ্যান পেল। শত বাধা-বিপত্তি উল্লংঘন ক'রে অর্থ পেল, মান-সম্মান পেল, সুখ পেল, শান্তি পেল। এ তো ইহকালে ক্ষণস্থায়ী পুরস্কার। আর সে পথে অবিচলিত থাকলে পরকালে আছে আসল সুখ, চিরস্থায়ী ইচ্ছা-সুখের বিলাস-গৃহ ও চিরকুমারী পরমা সুন্দরী বেহেশ্‌তী হুরী।

আসলে সে পথ যতই বন্ধুর হোক, সে পথ যতই কন্টকাকীর্ণ হোক, সে পথ আসলে জিহাদের পথ, সে পথ চির সুখময় বেহেশ্‌তের পথ। সুতরাং হে তালেবে-ইল্‌ম! সেই পথে তোমায় খোশ আমদেদ, সুস্বাগতম।

'বন্ধুর পথে চলিব আবার বন্ধুরা এস ফিরে,
সেই আগেকার নিত্যমুগ্ধ প্রাণ প্রবাহের তীরে।'

সমাপ্ত